আইনি সাক্ষরতা ও আইনি ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২য় অংশ)

(Training on Legal literacy and Legal Empowerment)

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

Legal Empowerment and Strengthening Access of Women and Vulnerable Groups in Selected Slums to Improve Water and Sanitation Services Project.

Executive Agency: Dhaka WASA

Consultant: BASA - BISR (JV)

পূর্বাভাস

ঢাকা শহরের নির্বাচিত নিম্ম আয়ের সম্প্রদায় বা এলআইসি (LIC) এর পানি এবং পয়:নিষ্কাশন সেবা উন্নত করার জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (Asian Development Fund) সহায়তায় মহিলা ও ক্ষতিগ্রস্থ বা অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ জোরদার ও আইনের ক্ষমতায়ন শক্তিশালী করার জন্য ঢাকা ওয়াসা (Dhaka WASA)- এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (Asian Development Bank) সাথে পরিবেশগতভাবে টেকসই পানি সরবরাহ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। নির্বাচিত এলআইসি বা নিম্ম আয়ের সম্প্রদায়ের পানি এবং পয়:নিষ্কাশন সেবা উন্নত করার জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (Asian Development Bank) আর্থিক সহায়তায় ঢাকা শহরের নিম্ম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ঢাকা ওয়াসা পানি ও পয়:নিষ্কাশন বা সেনেটারি সেবা প্রদান করার পাশাপাশি আইনি ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে । যা ঢাকা ওয়াসা এর কার্যক্রমে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে । যৌথভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাসা ফাউন্ডেশন এবং বিআইএসআর (BASA-BISR (JV) । বাসা ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকা ওয়াসার সাথে পানি ও পয়:নিষ্কাশন এর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

ঢাকা শহরের নির্বাচিত নিম্ম আয়ের সম্প্রদায় বা এলআইসি (LIC) -এর পানি এবং পয়:নিষ্কাশন সেবা উন্নত করার পাশাপাশি আইনি ক্ষমতায়নের বিষয়টি ও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। নিম্ম আয়ের সম্প্রদায়ের আইনি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইনি সাক্ষরতা ও আইনি ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (**Training on Legal literacy and Legal Empowerment**) কোর্সটি সাজানো হয়েছে। কোর্সটি দুইটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় **অংশে দৈনন্দিন জীবনে আইনের মৌলিক ধারনা সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। যার মূল বিষয়সমূহ:** বাল্যবিবাহ, যৌতুক, তালাক , নারী / শিশু নির্যাতন ও যৌন হয়রানি, বিশেষভাবে সক্ষম ও হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক বৈষম্যতা, বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (এ ডি আর) সম্পর্কে ধারণা ।

আশা করি এই প্রশিক্ষন কোর্সের মাধ্যমে নিম্ম আয়ের সম্প্রদায় বা এলআইসি (LIC)-এর স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ আইনগত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং আইনগত অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবেন।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রকাশের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যারা যেভাবে সহায়তা করেছেন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ম্যানুয়ালের বিভিন্ন অংশে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ব্যবহারকারীদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমরা আশা করি এই ম্যানুয়ালটির তথ্যসমূহ এলআইসি (LIC) প্রতিনিধি ও মূল স্টেকহোল্ডার তথা ব্যবহারকারীদের এলআইসি (LIC) এলাকার **পানি এবং পয়:নিষ্কাশন সেবা উন্নত করার পাশাপাশি আইনি ক্ষমতায়নে** অগ্রনী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে । মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের মঙ্গল করুন।

ধন্যবাদান্তে

আ.ক.ম সিরাজুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
বাসা ফাউন্ডেশন-লিড পার্টনার
ঢাকা এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (ডিইএসডব্লিউএসপি)

আইনি সাক্ষরতা ও আইনি ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মূল বিষয়সমূহ ঃ

১.আইনি সাক্ষরতা
২.মৌলিক অধিকার
৩.পানি এবং পয়:নিষ্কাশন আইন /অধিকার (ওয়াসা এ্যাক্ট)
৪.ভিশন ২০৪১ ও এসডিজি (**Vision 2041 & SDG**)
৫.**Gender Equility & Social Inclusion-GESI of ADB**
৬.পারিবারিক আইন
৭.বাল্যবিবাহ
৮.যৌতুক
৯.তালাক
১০.নারী/শিশু নির্যাতন ও যৌন হয়রানি
১১.বিশেষভাবে সক্ষম ও হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক বৈষম্যতা
১২.বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (এ ডি আর)

সূচীপত্র

অধিবেশন-০০	ঃ ম্যানুয়াল ব্যবহার নির্দেশিকা
অধিবেশন-০০	ঃ প্রশিক্ষণ সূচী
অধিবেশন-০০	ঃ প্রশিক্ষণ সূচনা পর্ব, রেজিষ্ট্রেশন ও উদ্বোধন
অধিবেশন-০০	ঃ প্রত্যাশা যাচাই ও প্রাক-মূল্যায়ণ
অধিবেশন-০১	ঃ বাল্যবিবাহ সম্পর্কে ধারণা
অধিবেশন-০২	ঃ যৌতুক সম্পর্কে ধারণা
অধিবেশন-০৩	ঃ তালাক সম্পর্কে ধারণা
অধিবেশন-০৪	ঃ নারী / শিশু নির্যাতন ও যৌন হয়রানি সম্পর্কে ধারণা
অধিবেশন-০৫	ঃ বিশেষভাবে সক্ষম ও হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক বৈষম্যতা সম্পর্কে ধারণা
অধিবেশন-০৬	ঃ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এ ডি আর) সম্পর্কে ধারণা
মূল্যায়ন	ঃ প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন
সমাপনী অধিবেশন	ঃ সমাপনী

ম্যানুয়াল ব্যবহার নির্দেশিকা

আইনি স্বাক্ষরতা ও আইনি ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি তৈরী করা হয়েছে ১ দিনের জন্য। এই ম্যানুয়ালে মোট ০৬ টি পদক্ষেপ/ সেশন রয়েছে। প্রতিটি সেশনের কয়েকটি অংশ রয়েছে।

- ✓ অধিবেশন পরিকল্পনা ও বিন্যাস
- ✓ প্রশিক্ষকের জন্য তথ্য বা রেফারেন্স
- ✓ অংশগ্রহণকারীদের জন্য হ্যান্ডআউট

সেশন

প্রতিটি সেশন তৈরী করা হয়েছে কয়েকটি বিষয় নিয়ে । সেশনের অন্তর্ভুক্ত ও সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে সেশনগুলির ধারাবাহিক বিন্যাস করা হয়েছে। সেশনের শুরুতেই সেশনের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। সেশনগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে জ্ঞান, দক্ষতা ও শেখার মনোভাব তৈরী এবং তার ফলাফল ব্যাখ্যা করা যায়।

একটি সফল প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য যে বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ

১. প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা জেনে নেয়া আবশ্যক। একটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। ইংরেজীতে একে বলা হয় ”নীড এসেসমেন্ট”।

২. উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট বিষয় যা প্রশিক্ষণের পরে শিক্ষার্থীরা জানতে পারে।

৩. বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য নির্ধারণের পরেই আসে বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়।

যেমনঃ

- অপরিহার্য, যা অবশ্যই বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত হবে
- প্রয়োজনীয়, যা বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত
- প্রান্তিক, যা বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত করলেও করা যেতে পারে।

৪.প্রণালী বা নিয়ম

প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য একটি সঠিক প্রণালী বা নিয়ম ঠিক করতে হয়। প্রশিক্ষণের কতগুলি পদ্ধতি আছে, যেমনঃ

- **প্রশিক্ষকের বক্তৃতা অর্থাৎ বিষয় সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা**
- **ছোট দলের মাধ্যমে আলোচনা**
- উদাহরণ বা গল্প বলা
- ব্রেইন স্টর্মিং/মাথা খাটানো
- দলীয় কাজ
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি
- পারস্পারিক মতবিনিময়
- অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে উপস্থাপনা

৫.সময়

বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য সময় ঠিক করে নেয়া এবং বিষয়বস্তুও ধারা অনুযায়ী সাজিয়ে নেয়া।

৬.মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণের নিয়ম ও উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের শুরুতে পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং প্রশিক্ষণের শেষে বিষয় সংক্রান্ত সার্বিকজ্ঞান যাচাই করা যেতে পারে।

উপরের প্রত্যেকটি নিয়ম অথবা কয়েকটি নিয়মে প্রশিক্ষণ দেয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি কি হবে, পুরোপুরি নির্ভর করছে বিষয় এবং প্রশিক্ষকের উপর। এখানে প্রশিক্ষণের জন্য সবধরনের নিয়মগুলো দেয়া হলো।

একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের যা যা জানা উচিত

- একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের মধ্যে থাকতে হবে বিনীত ও মার্জিত ব্যবহার অর্থাৎ অন্যকে সম্মান করা।
- প্রশিক্ষককে হতে হবে পরিশ্রমী, উৎসাহী, হাসি-খুশি, কৌতুক প্রিয়, বিচক্ষণ, বিবেকবান ও ধৈর্য্যশীল।
- প্রশিক্ষক তার সুন্দর বাচনভঙ্গির সাহায্যে যে কোন বিষয় বারে বারে বুঝিয়ে বলতে প্রস্তুত থাকবেন।
- একজন দক্ষ প্রশিক্ষক শিক্ষা দেন, যুগের পরিবর্তনের সংগে তাল মিলিয়ে চলেন এবং প্রশিক্ষনের প্রয়োজনে অভিনেতার ভূমিকায় নামেন।
- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণেরসময় তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব চিন্তাধারাকে কাজে লাগান কিন্তু মনে রাখেন যে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ও ধ্যান ধারণা থাকতে ও পারে।
- প্রশিক্ষক বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করেন যাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়ে এবং তারা আলোচনায় এগিয়ে আসেন।
- একজন ভাল প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের সময় প্রত্যেকের চোখে চোখ রেখে কথা বলেন এবং খেয়াল রাখেন যেন কারো দিকে বেশী বা কারো দিকে কম মনোযোগ না হয়।
- অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য সময়ের ব্যাপারেও বিশেষ খেয়াল রাখেন এবং ছবি, তালিকা ও ছোট ছোট গল্প বলেন। সুযোগ থাকলে ভিডিও দেখাতে পারেন।
- অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত গঠনে সাহায্যের জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতার গল্প বলেন।
- বিষয়বস্তু আলোচনার শেষে একটি সারাংশ উপস্থাপন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করেন তারা কোন ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে কি না? পরিশেষে আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করেন।
- সেশনের শেষে প্রশিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টির এবং অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন করেন।

প্রশিক্ষণের সাধারণ উদ্দেশ্যঃ

প্রশিক্ষণ কোর্সের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো ঢাকা শহরের নিম্ম আয়ের জনগোষ্ঠির পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সুবিধা ভোগ করার ক্ষেত্রে **আইনি সাক্ষরতা ও আইনি ক্ষমতায়ন** বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং আইনি স্বাক্ষরতা ও আইনি ক্ষমতায়ন বিষয়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে ঢাকা শহরের নিম্ম আয়ের জনগোষ্ঠির পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সুবিধা উন্নয়নে তথা আইনি সমস্যা সমাধানে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- আইনি স্বাক্ষরতা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হবেন।
- মৌলিক অধিকার সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন
- ঢাকা ওয়াসার পানি ও পয়: নিস্কাশন আইন সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং অধিকার আদায় করবেন।
- বাংলাদেশ সরকারের রুপকল্প-২০৪১ ও এস ডি জি (Vision-2041 & SDG) সম্পর্কে জানতে পারবেন
- এডিবি-এর Gender Equility & Social Inclusion – GESI সম্পর্কে জানতে পারবেন
- পারিবারিক আইন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আইনি স্বাক্ষরতা ও আইনি ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী(২য় অংশ) ঃ

স্থানঃ--------------------

তারিখঃ--------------------------

অংশগ্রহণকারীঃ এলআইসি'র কার্যকরী কমিটির নের্তৃবৃন্দ ও সদস্যগণ

সময়কালঃ ১দিন

সময়	অধিবেশন নং	মৌলিক বিষয়বস্ত	যা যা আলোচনা করা হবে	উপায়/পদ্ধতি	সহায়ক
৯:০০-৯:১৫	সূচনা পর্ব	উদ্বোধন	রেজিস্ট্রেশন, সার্বজনীন প্রার্থনা ও উদ্বোধনী অধিবেশন	রেজিস্ট্রেশন পেপার	
৯:১৫-০৯:৩০	পরিচিতি	জড়তা বিমোচন ও পরিচিতি	জড়তা বিমোচন ও পরিচিতি	গেমস	
৯:৩০-০৯:৪৫	প্রাক মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা যাচাই	প্রাথমিক দক্ষতা যাচাই	প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা ও প্রাক-মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য বর্ণনা	পোস্টার প্রদর্শন,প্রশ্ন পত্র	
০৯:৪৫-১০:৩০	অধিবেশন -১	বাল্যবিবাহ	• বাল্যবিবাহ বলতে কি বুঝি? • বাল্য বিবাহ হলে করনীয় • বাল্যবিবাহ হলে আইনি প্রতিকার	মুক্ত চিন্তার ঝড়, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	
১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি				
১১:০০-১১:৪৫	অধিবেশন-২	যৌতুক	• যৌতুক বলতে কি বুঝি • যৌতুক ও উপহার এর মধ্যে পার্থক্য কি • যৌতুকের শাস্তি	মুক্ত চিন্তার ঝড়, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	
১১:৪৫-১২:১৫	অধিবেশন -৩	তালাক	• তালাক কি? • তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের উপায় • তালাকে নোটিশ প্রদানের গুরুত্ব • তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর নিকট স্ত্রীর পাওনা	মুক্ত চিন্তার ঝড়, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	
১২:১৫-০১:০০	অধিবেশন-৪	নারী / শিশু নির্যাতন ও যৌন হয়রানি	• নারী ও শিশু নির্যাতন বলতে কি বুঝি • যৌন হয়রানি প্রতিরোধের উপায় • নারী / শিশু নির্যাতন ও যৌন হয়রানি হলে করণীয়	মুক্ত চিন্তার ঝড়, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	
০১:০০-০২:০০	দুপুরের খাবার				

সময়	অধিবেশন নং	মৌলিক বিষয়বস্তু	যা যা আলোচনা করা হবে	উপায়/পদ্ধতি	সহায়ক
০২:০০-০২:৪৫	অধিবেশন - ৫	বিশেষ ভাবে সক্ষম ও হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক বৈষম্যতা	• প্রতিবন্ধী ও হিজড়া বলতে আমরা কাদের বুঝি • প্রতিবন্ধী ও হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক বৈষম্যতা দূরীকরণে করনীয়	মুক্ত চিন্তার ঝড়, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	
০২:৪৫-০৩:১৫	অধিবেশন - ৬	বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (এডিআর)	• এডিআর বলতে কি বুঝি? • এডিআর করার নিয়ম নীতিসমূহ • যে সকল বিষয়ে এডিআর করা যাবে • যে সকল বিষয়ে এডিআর করা যাবে না	মুক্ত চিন্তার ঝড়, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	
০৩:১৫-০৩:৩০	সমগ্র দিনের পুনরালোচনা			আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	
০৩:৩০-০৩:৫০	কোর্স মূল্যায়ন	সমাপনী মূল্যায়ন ও কোর্স মূল্যায়ন	• প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন ও কোর্স পর্যালোচনা	প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যাচাই	
০৩:৫০-০৪:০০	প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি		• সমাপনী অধিবেশন	বক্তৃতা	

অধিবেশন শিরোনামঃ সূচনা পর্ব

আলোচ্য বিষয়ঃ

- প্রার্থনা
- রেজিস্ট্রেশন
- স্বাগত বক্তব্য ও উদ্বোধন

উদ্দেশ্যঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

ক) সমবেতভাবে সার্বজনীন প্রার্থনা করবেন।

খ) নাম, পদবী, এলআইসি-র নাম সহ একটি রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করবেন।

পদ্ধতিঃ সমবেত প্রার্থনা, সঙ্গীত এবং বক্তৃতা।

উদ্দেশ্যঃ প্রার্থনা ও সেশন উদ্বোধন

উপকরণঃ ফেষ্টুন, ব্যানার, লিফলেট, সিজার, এন্টি কাটার, টিস্যু, পোষ্টার পেপার, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টি মিডিয়া এবং প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম, ডিজিটাল ব্যানার, প্রশ্ন পত্র, ফোল্ডার, নোট বুক, নোট প্যাড, ব্রাউন পেপার, কলম, পেনসিল, কালার পেপার, আইকা গাম, কষ্টেপ, বোর্ড পিন, ফিতা।

সময়ঃ ১৫ মিনিট

প্রক্রিয়াঃ

- ➢ সহায়ক/প্রশিক্ষণ প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত ভাবে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে এই সেশন শুরু করুন।
- ➢ সর্বজনীন প্রার্থনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হবে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে একজনকে প্রার্থনা পরিচালনা করবার দায়িত্ব দিন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে কেউ প্রার্থনার জন্য উপযুক্ত কেউ থাকলে আগে থেকেই তাকে অনুরোধ করুন।
- ➢ রেজিস্ট্রেশন শীটে প্রশিক্ষণার্থীদের নাম, এলআইসি-র নাম এবং পদবী উল্লেখ সহ স্বাক্ষর করতে বলুন
- ➢ সংস্থার উর্ধ্বতন কেউ উপস্থিত থাকলে তিনি অথবা প্রশিক্ষকদের মধ্য থেকে কেউ স্বাগত বক্তব্য দিয়ে প্রশিক্ষণের শুভ সূচনা করুন

এই অধিবেশনে সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

অধিবেশন শিরোনাম: পরিচিতি

আলোচ্য বিষয়:

- জড়তা বিমোচন ও পরিচিতি

উদ্দেশ্য:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

ক) একে অন্যের সাথে পরিচিত হবেন
খ) নিজেকে অপরের সামনে তুলে ধরতে পারবেন
গ) নিজেদের জড়তা দূর করতে সক্ষম হবেন

পদ্ধতি: খেলা

উপকরণ: ফেষ্টুন, ব্যানার, লিফলেট, সিজার, এন্টি কাটার, টিস্যু, পোষ্টার পেপার, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টি মিডিয়া এবং প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম, ডিজিটাল ব্যানার, প্রশ্ন পত্র, ফোল্ডার, নোট বুক, নোট প্যাড, ব্রাউন পেপার, কলম, পেনসিল, কালার পেপার, আইকা গাম, কস্টেপ, বোর্ড পিন, ফিতা, লম্বা সূতার গুটি ইত্যাদি।

সময়: ১৫ মিনিট

প্রক্রিয়াঃ

- সবাইকে খোলা মনে ডেকে একত্রিত করে নিন বা সচেতন করুন।
- সবাইকে বলুন আমরা এখানে একদিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে এসেছি তাই আমাদের সবার পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা একটি খেলার মাধ্যমে পেয়ার গ্রুপ পদ্ধতিতে পরিচিত হবো।
- অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের পছন্দের পেয়ার খুঁজে নিতে বলুন অথবা পাশাপাশি বসা অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে পেয়ার তৈরী করে দিন। পেয়ার তৈরী সম্পন্ন হলে তাদেরকে দুই মিনিট সময় দিন যাতে করে তারা পরস্পরের সম্পর্কে জানতে পারেন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করতে পারেন। এর পর প্রতি পেয়ারের একজনকে অন্য জনের পরিচয় সবার সামনে দিতে বলেন।
- এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী সকলের সম্পর্কে জানার সুযোগ হবে এবং সেই সাথে একটি প্রাণবন্ত পরিবেশের মাধ্যমে সবার মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরী হবে।
- এরপর সহায়ক নিজ পরিচয় দিন।
- পেয়ার ব্যাতিরেকে অন্য যে কোন উপযোগী পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

এই অধিবেশনে সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

অধিবেশন শিরোনামঃ প্রত্যাশা যাচাই ও প্রাক মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়ঃ

- প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্ব জ্ঞান যাচাই
- প্রত্যাশা যাচাই
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা

উদ্দেশ্যঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

ক) অংশগ্রহনকারীরা তাদের প্রত্যাশা জানাবেন
খ) প্রাক-মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন
গ) প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী সহায়ক তার সেসন পরিকল্পনা পরিচালিত করতে পারবেন

পদ্ধতিঃ বক্তৃতা এবং আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর
সময়ঃ ১৫ মিনিট

উপকরণঃ ফেষ্টুন, ব্যানার, লিফলেট, সিজার, এন্টি কাটার, টিস্যু, পোষ্টার পেপার, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টি মিডিয়া এবং প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম, ডিজিটাল ব্যানার, প্রশ্ন পত্র, ফোল্ডার, নোট বুক, নোট প্যাড, ব্রাউন পেপার, কলম, পেনসিল, কালার পেপার, আইকা গাম, কষ্টেপ, বোর্ড পিন, ফিতা।

প্রক্রিয়াঃ

- সহায়ক সকলকে একটি করে ভিপ কার্ড দিয়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে এই প্রশিক্ষণে তাদের প্রত্যাশা অথবা তারা কি জানতে চায় তা লিখতে বলবেন । লেখা শুরুর আগে অংশগ্রহণকারীদের সকলকে ভিপ কার্ড লেখার নিয়ম বলে দিতে হবে।
- প্রত্যাশা লেখা হয়ে গেলে কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন এবং জোরে পড়ে ভিপ বোর্ডে সহ-সহায়কের সহোযোগিতা নিয়ে ডিসপ্লে করুন। ডিসপ্লে করার সময়ে প্রত্যাশাগুলোর প্রকার ভাগ করে নিন।
- এবার সকলকে লেখার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন এবং প্রশিক্ষণের সিডিউল বিতরণ করে আলোচনার মাধ্যমে জানান যে তারা যে সকল প্রত্যাশা দিয়েছেন তা এখানে আছে এবং যেগুলো নেই সেগুলো কেন নেই এবং কিভাবে প্রত্যাশা পূরণ করা হবে তার বর্ণনা দিন।
- এপর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভৌত সুবিধা বর্ণনা করুন। খাবারের ব্যবস্থা কোথায় করা হয়েছে তা জানিয়ে দিন।
- প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে সর্বসম্মতিক্রমে (দল গঠনের মাধ্যমে) একটি দলকে ব্যবস্থাপনা, একটি দলকে প্রতিবেদন, একটি দলকে শিখন ও একটি দলকে বিনোদনের দায়িত্ব দিন। এটি তারা প্রতিদিন উপস্থাপন করবে।
- প্রশিক্ষণে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কিছু নিয়ম কানুন সর্বসম্মতিক্রমে তৈরী করুন যেমন- সময় মেনে চলা, মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা, পাশাপাশি কথা না বলা ইত্যাদিপূর্বে তৈরীকৃত প্রাক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রশ্ন-পত্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্তমান ধারণা সংরক্ষণ করুন।
- এই অধিবেশনে সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

Legal Empowerment and Strengthening Access of Women and Vulnerable Groups

আইনি স্বাক্ষরতা ও আইনি ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (২য় অংশ)

বিষয়: প্রাক/পরবর্তি প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা
তারিখঃ ------------------------
সময়কালঃ ১ দিন
অংশগ্রহণকারীঃ ------------------ নির্বাচিত এলআইসি নের্তৃবৃন্দ ও সদস্য

প্রশিক্ষণার্থীর নামঃ পূর্ণমানঃ ৫০ সময়ঃ ১৫ মিনিট

১. বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে বিয়ের সর্বনিম্ম বয়স কত ?

২. বাল্য বিবাহ বলতে কি বুঝায় ? এর শাস্তিগুলো কি কি ?

৩. যৌতুক বলতে কি বুঝায় ?

৪. তালাক দেওয়ার নিয়ম কি ?

৫. যৌন হয়রানির শাস্তিগুলো কি কি?

৬. জরুরী সেবা সমূহের নাম্বার

সহায়কের জন্য নোট

অধিবেশন ০১- শিরোনামঃ বাল্য বিবাহ

আলোচ্য বিষয়:

- বাল্যবিবাহ বলতে কি বুঝি
- বাল্য বিবাহ হলে করনীয়
- বাল্য বিবাহ হলে আইনি প্রতিকার

উদ্দেশ্য:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

ক) বাল্যবিবাহ বলতে আমরা কি বুঝি এ সম্পর্কে জানতে পারবে

খ) বাল্য বিবাহ হলে করনীয় সম্পর্কে জানতে পারবে

গ) বাল্য বিবাহ হলে আইনি প্রতিকারগুলি কি কি এ সম্পর্কে জানতে পারবে

পদ্ধতিঃ লেকচার, প্রশ্ন উত্তর ও মুক্ত আলোচনা

উপকরণ: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টি মিডিয়া, ভিপ কার্ড এবং প্রজেক্টর

সময়: ৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া:

- ➢ সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা শুরু করুন
- ➢ বাল্যবিবাহ কি এবং বাল্য বিবাহ বলতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে আলোকপাত করুন এবং স্থানীয় কমিউনিটির প্রেক্ষাপটে বিষয়গুলি আলোচনা করুন। আলোচনার সময়ে সম্ভব হলে স্থানীয় বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরুন। মুক্ত আলোচনায় সবাইকে অংশগ্রহণ করতে বলুন
- ➢ বাল্যবিবাহ হলে করনীয় সম্পর্কে আলোচনা করুণ
- ➢ বাল্যবিবাহ হলে কিভাবে আইনি প্রতিকার পাওয়া যায় এই বিষয়ে আলোচনা করুণ।
- ➢ সবাইকে মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন

অধিবেশন ০১ ঃ বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের প্রভাব

বাল্যবিবাহের প্রভাব মেয়েদের উপর ব্যাপক, যা পাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও থেকে যায়। কিশোরী বয়সে বা তারও আগে বিবাহিত নারীরা কম বয়সে গর্ভধারণ করার ফলে স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভোগে। কম বয়সে গর্ভধারণ সন্তান জন্মদানে জটিলতা সৃষ্টি করে। গরীব দেশসমূহে অল্প বয়সে গর্ভধারণ শিক্ষার জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, যা তাদের অর্থনৈতিক মুক্তিকে বাধাগ্রস্থ করে। বাল্যবিবাহের শিকার নারীরা সাধারণত পারিবারিক সহিংসতা, শিশু যৌন নির্যাতন এবং বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার হয়।

স্বাস্থ্য

বাল্যবিবাহ মেযয়েদের স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। উন্নয়নশীল বিশ্বে গর্ভধারণ ও সন্তানধারণের জটিলতা অল্প বয়সে নারী মৃত্যুর অন্যতম কারণ। ১৫-১৯ বছর বয়সী গর্ভবতী নারীদের মাতৃমৃত্যুর সম্ভাবনা ২০ বছর বয়সী গর্ভবর্তী নারীদের তুলনায় দ্বিগুণ। আর ১৫ বছরের কম বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যুর সম্ভাবনা ৫-৭ গুন বেশি। যেসব নারী ১৫ বছরের পূর্বে সন্তান জন্মদান করে তাদের ফিস্টুলা বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৮৮%। যা বিভিন্ন সংক্রমনের অন্যতম কারণ। ২০ বছর বয়সী বিবাহিত নারীদের যৌন সংক্রমিত রোগের সম্ভাবনা বেশি।

বাল্যবিবাহ শুধু মাত্র মায়য়ের স্বাস্থ্যই না বরং শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ও হুমকি স্বরূপ। ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের অপরিণত সন্তান জন্মদান বা কম ওজনের সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা ৩৫-৫৫%। তাছাড়াও শিশু মৃত্যুর হার ৬০% যখন মায়ের বয়স ১৮ বছরের নিচে। যেসব নারী কম বয়সে শিশুর জন্ম দেয় ঐসব শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয় ও শিশু অপুষ্টিতে ভোগার সম্ভাবনা বেশি। বাল্যবিবাহের প্রাদুর্ভাবের কারণে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পায়।

স্বাক্ষরতা এবং দারিদ্র্য

বাল্যবিবাহ মেয়েদের শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটায়, সাধারণত অনুন্নত দেশসমূহে। একইভাবে নিরক্ষর মেয়েদের বাল্যবিবাহের হার বেশি। যেসব মেয়েদের শুধু প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে তাদের ১৮ বছরের নিচে বিয়ের সম্ভাবনা মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের তুলনায় দ্বিগুণ। এবং একেবারে নিরক্ষর মেয়েদের ১৮ বছরের নিচে বিয়ের সম্ভাবনা মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের তুলনায় তিনগুন বেশি। পারিবারিক দায়িত্ব পালন ও সন্তান লালন-পালনের জন্য বিয়ের পর বেশিরভাগ মেয়েদের শিক্ষা জীবন ব্যাহত হয়। শিক্ষা ছাড়া মেয়ে এবং নারীদের উপার্জনের সামান্য পথ -ই খোলা থাকে। এ কারণে নারীদের ক্রমাগত দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করতে হয়, বিশেষত যদি তাদের স্বামী মারা যায় বা তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। যেহেতু বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েরা স্বামীর চেয়ে তুলনামূলক কম বয়সী হয়, তাই তারা কম বয়সে বিধবা হয় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটে পড়ে।

পারিবারিক সহিংসতা

অল্প বয়সে কম শিক্ষিত বিবাহিত মেয়েদের পারিবারিক সহিংসতার হার বেশি। বিয়ের পর সাধারণত স্বামীর পরিবারে থাকার কারণে গ্রাম বা অন্য এলাকায় চলে যেতে হয়। এর ফলে শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটে, আবার নিজ পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে যাবার ফলে সে সামাজিক সমর্থন ও হারায়। মেয়ে অল্প বয়সী হওয়ার কারণে সে তার স্বামীর বাধ্য হবে- এমনটাই মনে করে স্বামীর পরিবার। পরিবার হতে এই বিচ্ছিন্নতা নারীর মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠে।

স্বামীর সঙ্গে বয়সের ব্যবধান বেশি হওয়ায় মেয়েদের উপর সহিংসতা ও জোরপূর্বক সঙ্গমের ঘটনা বেশি হয়। কম বয়সে বিবাহিত মেয়েরা বিবাহ পরবর্তী সহিংসতায় বেশি ভোগে। কম বয়সে বিয়ের কারণে মেয়েরা সম্পূর্ণরূপে স্বামীর উপর নির্ভর করে। পারিবারিক ও যৌন নির্যাতন তাদের জীবন ব্যাপী মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্থ করে তোলে, কারণ ঐ সময় তাদের মানসিক বিকাশ গঠনের সময়। এ কারণে তারা বিষন্নতা এমনকি আত্হত্যার চিন্তাও করে।

নারী অধিকার

জাতিসংঘ ঘোষণা করে, বাল্যবিবাহ মানবাধিকারের জন্য হুমকি স্বরূপ। নারীদের প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য দূর করার জন্য সম্মেলন (সিইডিএডাব্লিউ), শিশু অধিকার আদায়ের জন্য কমিটি (সিআরসি) এবং সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষক কমিটি বাল্যবিবাহ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করেন। বাল্যবিবাহ নারীদের অন্য অনেক অধিকার ও লঙ্ঘন করে। যেমন, লিঙ্গ ও বয়সের ভিত্তিতে সমতা, স্বাস্থ্য খাতে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা, দাসত্ব থেকে মুক্তি, শিক্ষার অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা, সহিংসতা থেকে মুক্তি এবং বিয়েতে নিজ সম্মতি প্রদানের অধিকার। এই আইনগুলির লঙ্ঘনের প্রভাব শুধুমাত্র নারীর উপরই না, তার সন্তান এবং বৃহত্তর সমাজের উপরও পড়ে।

উন্নয়ন

উচ্চ হারে বাল্যবিবাহ দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে কারণ বাল্যবিবাহ নারী শিক্ষা ও শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণে বাধা দেয়। কিছু গবেষকের মতে, বাল্যবিবাহের উচ্চ হার দারিদ্র্য বিমোচনে ৮টি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রত্যেকটিকে এবং বৈশ্বিক প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্থ করে।

ইউনিসেফ নেপালের এক রিপোর্টে জানায়, বাল্যবিবাহের ফলে উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হয়, দরিদ্র্যতা বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্যহানি ঘটে, যা সমগ্র নেপালের উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এক জরিপে দেখা যায়, যেসব নারী ২০ বছরের পরে বিয়ে করে তারা নেপালি নারীদের মধ্যে মোট আয়ের বৃদ্ধিতে দেশের জিডিপি ৩.৮৭% বৃদ্ধি করতে পারে। এই হিসেব পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাল্যবিবাহের ফলে নারী শিক্ষার হার হ্রাস পায় ও নারী বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি তাদের সন্তানদের মধ্যেও শিক্ষার নিম্ন হার ও দারিদ্র্যের উচ্চ হার লক্ষ্য করা যায়।

বাল্যবিবাহ রোধে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

ডিসেম্বর, ২০১১ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ১১ই অক্টোবরকে "আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস" হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১১ই অক্টোবর, ২০১২ সালে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস পালন করা হয়, যার মুল প্রতিপাদ্য ছিল বাল্যবিবাহ নির্মূল করা। ২০১৩ সালে প্রথম জাতিসংঘ মানবাধিকার সভায় বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিয়ের বিরুদ্ধে নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। এতে বলা হয়, বাল্যবিবাহ হল মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং এই প্রথা বন্ধ করার ব্যাপারে সংকল্প ব্যক্ত করা হয়। ২০১৪ সালে জাতিসংঘের নারীর অবস্থান শীর্ষক কমিশনে এক দলিল পেশ করা হয় যেখানে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ দূর করার ব্যাপারে ঐকমত্য ঘোষণা করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী, বাল্যবিবাহ রোধে প্রধান উপায় হল নারীদের শিক্ষা অর্জন, বিবাহের নুন্যতম বয়স সংক্রান্ত আইন কার্যকরণ এবং অভিভাবকদের বাল্যবিবাহের ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করা। বাল্যবিবাহ রোধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করা, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো, নারী শিক্ষা সমর্থন এবং নারীদের ও তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক সাহায্য করা।

ভারতে হরিয়ানা রাজ্যের স্থানীয় সরকার এক কর্মসূচী গ্রহণ করে যাতে দরিদ্র্য পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করা হয় যদি তারা তাদের কন্যা সন্তানকে ১৮ বছর পর্যন্ত বিয়ে না দিয়ে স্কুলে পাঠায়। এর ফলে ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ের হার কমে যায়।

সংশ্লিষ্ট উপাত্ত

২০-২৪ বছর বয়সী বিবাহিত নারীদের মধ্যে ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়েছে এমন নারীদের শতকরা হার নিচের টেবিলে দেয়া হল। আন্তর্জাতিক নারী গবেষণা কেন্দ্র (আইসিআরডব্লিউ) এবং ইউনিসেফের তথ্য ১০-২০ বছর বয়সী নারীদের উপর জরিপের ভিত্তিতে এবং জাতিসংঘের তথ্য ১০-১৫ বছর বয়সী নারীদের উপর জরিপের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

যেহেতু Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XIX of 1929) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করে নূতনভাবে প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ

১। (১) এই আইন বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞাঃ

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অপ্রাপ্ত বয়স্ক" অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ২১ (একুশ) বৎসর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো পুরুষ এবং ১৮ (আঠারো) বৎসর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো নারী;

(২) "অভিভাবক" অর্থ Guardians and Wards Act, ১৮৯০ (Act No. VIII of ১৮৯০) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ভরণ-পোষণ বহনকারী ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) "প্রাপ্ত বয়স্ক" অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ২১ (একুশ) বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন এমন কোনো পুরুষ এবং ১৮ (আঠারো) বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন এমন কোনো নারী;

(৪) "বাল্যবিবাহ" অর্থ এইরূপ বিবাহ যাহার কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক; এবং

(৫) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন ঃ

৩। সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের নিমিত্ত, জাতীয়, জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং স্থানীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি সমন্বয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং উহাদের কার্যাবলি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

বাল্যবিবাহ বন্ধে কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির সাধারণ ক্ষমতা ঃ

৪। ধারা ৫ এর বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি কোন ব্যক্তির লিখিত বা মৌখিক আবেদন অথবা অন্য কোন মাধ্যমে বাল্যবিবাহের সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তিনি উক্ত বিবাহ বন্ধ করিবেন অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বাল্যবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের শাস্তিঃ

৫। (১) আদালত, স্ব-উদ্যোগে বা কোন ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, কোন বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে অথবা বাল্যবিবাহ অত্যাসন্ন তাহা হইলে আদালত উক্ত বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) আদালত স্বেচ্ছায় বা অভিযোগকারী ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদন্ডে অনাদায়ে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

মিথ্যা অভিযোগ করিবার শাস্তি ঃ

৬। কোন ব্যক্তি ধারা ৫ এর অধীন মিথ্যা অভিযোগ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড অথবা অনধিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

বাল্যবিবাহ করিবার শাস্তি ঃ

৭। (১) প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তিযোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৮ এর অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা দন্ড প্রদান করা হইলে উক্তরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষকে শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিচার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

বাল্যবিবাহ সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতাসহ অন্যান্য ব্যক্তির শাস্তিঃ

৮। পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি, আইনগতভাবে বা আইন বহির্ভূতভাবে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন হইয়া বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে কোন কাজ করিলে অথবা করিবার অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করিলে অথবা স্বীয় অবহেলার কারণে বিবাহটি বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিবার শাস্তি ঃ

৯। কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

বাল্যবিবাহ বন্ধে উদ্যোগী হইবার শর্তে বাল্যবিবাহের অভিযোগ হইতে অব্যাহতিঃ

১০। এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালতের নিকট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে বাল্যবিবাহের উদ্যোগের সহিত জড়িত বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই এইরূপ অভিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে, যদি এই মর্মে মুচলেকা বা বন্ড প্রদান করেন যে, তিনি ভবিষ্যতে বাল্যবিবাহের সহিত সম্পৃক্ত হইবেন না এবং তাহার নিকটবর্তী এলাকায় বাল্যবিবাহ বন্ধে উদ্যোগী হইবেন তাহা হইলে মুচলেকা বা বন্ডের শর্তানুযায়ী তাহাকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে।

বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের জন্য বিবাহ নিবন্ধনের শাস্তি, লাইসেন্স বাতিল ঃ

১১। কোন বিবাহ নিবন্ধক বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অনূর্ধ ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং তাহার লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিল হইবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “বিবাহ নিবন্ধক” অর্থ Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার এবং Christian Marriage Act, 1872 (Act No. XV of 1872), Special Marriage Act, 1872 (Act No. III of 1872) ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত বিবাহ নিবন্ধক।

বয়স প্রমাণের দলিলঃ

১২। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক নারী বা পুরুষের বয়স প্রমাণের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয় পত্র, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট অথবা পাসপোর্ট আইনগত দলিল হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ক্ষতিপূরণ প্রদানঃ

১৩। (১) এই আইনের অধীন আরোপিত অর্থদন্ড হইতে প্রাপ্ত অর্থ ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ" অর্থ বাল্যবিবাহের যে পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত জরিমানা হইতে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হইবে।

অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা এবং অ-আপোষযোগ্যতাঃ

১৪। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং অ-আপোষযোগ্য হইবে।

বিচার পদ্ধতি ঃ

১৫। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্য Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর Chapter XXII এ বর্ণিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

সরেজমিনে তদন্ত ঃ

১৬। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অভিযোগ বা কার্যধারা নিস্পত্তির ক্ষেত্রে ঘটনার সত্যতা নিরূপণের নিমিত্ত আদালত সরেজমিনে তদন্ত করিতে পারিবে অথবা কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি বা অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ তদন্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ তদন্ত কাজ ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করার সম্ভব না হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক অতিরিক্ত ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তৎসম্পর্কে আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ ঃ

১৭। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

অপরাধ আমলে নেয়ার সময়সীমা ঃ

১৮। এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইবার ২(দুই) বৎসরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা না হইলে আদালত উক্ত অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবে না।

বিশেষ বিধান ঃ

১৯। এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়স্কের সর্বোত্তম স্বার্থে, আদালতের নির্দেশ এবং পিতা-মাতা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতিক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে, বিবাহ সম্পাদিত হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ

২০। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত ঃ

২১। (১) Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XIX of 1929), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Act এর অধীন -

(ক) কৃত কোন কাজ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) দায়েরকৃত কোন মামলা বা কার্যধারা কোন আদালতে চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত Act রহিত হয় নাই।

ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশঃ

২২। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

সহায়কের জন্য নোট

অধিবেশন ০২- শিরোনাম ঃ যৌতুক

আলোচ্য বিষয় :

- যৌতুক বলতে কি বুঝি
- যৌতুক ও উপহার এর মধ্যে পার্থক্য কি
- যৌতুকের শাস্তি

উদ্দেশ্য:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. যৌতুক বলতে কি বুঝি সম্পর্কে জানতে পারবেন

খ. যৌতুক ও উপহার এর মধ্যে পার্থক্য কি নির্ধারণ করতে পারবেন

গ. যৌতুকের শাস্তি সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবেন

পদ্ধতি ঃ মুক্ত চিন্তার ঝড়, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর

উপকরণ : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টি মিডিয়া, ভিপ কার্ড এবং প্রজেক্টর

সময়: ৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া :

- সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা শুরু করুন
- যৌতুক বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- যৌতুক ও উপহার বলতে কি বুঝায় তা অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন এবং বিশদভাবে আলোচনা করুন। যৌতুক ও উপহার এর মধ্যে পার্থক্য বিস্তারিত আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।
- যৌতুক গ্রহণ এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শাস্তি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন।
- সবাইকে মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন

অধিবেশন-০২ ঃ যৌতুক

যৌতুক প্রথা ঃ

বিয়ের সময় মেয়েকে যৌতুক দেয়ার প্রথা অনেক প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে যা এখনও বিশ্বের কিছু কিছু জায়গায় প্রচলিত আছে। এ প্রথায় মেযয়ের বিয়েতে অভিভাবক সম্পত্তি দান করে যা বেশিরভাগ পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক হুমকিস্বরূপ। যৌতুকের জন্য সম্পদ জমানো ও সংরক্ষণ করার যে প্রতিবন্ধকতা তা সাধারণ ব্যাপার। একারণে মেয়ের পরিবার কিছু নগদ অর্থ বা জমিজমা যোগাড় করার সাথে সাথেই মেয়ের বয়স বিবেচনা না করেই বিয়ে দিতে তৎপর হয়।

মেয়েদের ক্ষেত্রেও যৌতুক দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে। তবে তাকে কনের মূল্য বা পণ নির্ধারণ বলা হয়। এই রীতিতে বর কনের পরিবারকে বিয়েতে রাজি করানোর জন্য পণের টাকা দিয়ে থাকে। কিছু দেশে কনের বয়স যত কম হয়, তার উপর নির্ধারিত পণের মূল্য তত বেশি হয়। এই রীতির কারণে মেয়ের পরিবার মেয়েকে তাড়াতাড়ি এবং সর্বোচ্চ পণদাতার কাছেই বিয়ে দিতে উদ্যত হয়। দুর্বল অর্থনীতিতে এভাবেই পরিবার আয়ের উৎস অনুসন্ধান করে।

- যৌতুক দাবির অন্যতম প্রধান কারণঃ
- দারিদ্র্য
- নিরক্ষরতা
- বেকারত্ব
- অপরাধ

যৌতুকের কারণ ও প্রতিকারঃ

পৃথিবী এগিয়ে চলছে তড়িৎ গতিতে। পরিবর্তনের দূরন্ত গতিপ্রবাহে বদলে যাচ্ছে প্রায় সবকিছুই। পালা বদলের মঞ্চে অনেক কিছুর হচ্ছে রুপান্তর, হচ্ছে আধুনিকীকরণ। অত্যাধুনিক সভ্যতার হাত ধরে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। আমরাও আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত পরিবেশ, প্রথা, পরিস্থিতি ও সমস্যার সমাধানে যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যতটা প্রাপ্তি যতটা অগ্রগতি ঠিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে ততটা অপ্রাপ্তি ততটা অবণতি যেন পাল্লা দি য়ে চলছে। ক্ষুদ্র এই দেশ বাংলাদেশ। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ শব্দটি লেখার জায়গা হয় না। তবুও বাংলাদেশ তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশ্বের দরবারে আপন আসন গ্রহণ করেছে। সত্যিই এ প্রাপ্তি গৌরবের এ প্রাপ্তি সম্মানের। লজ্জার ইতিহাসও যে নেই, তাতো নয়। তবুও আমরা আশাবাদী। তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য পীড়িত এ দেশ অজস্র সমস্যার ভারে জর্জরিত। আমরা যেন আমা দের সৃজনশীল মনোভাব, আদর্শ মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনাবোধ সব ধুলোয় লুন্ঠিত করছি। হৃদয়ের মহৎ পরিকল্পনাগুলো খোয়াতে বসেছি।

সময়ের পথ পরিক্রমায় দুষ্টক্ষতের মতই বাসা বেঁধেছে যৌতুক প্রথা আমাদের অন্তরে ও সমাজে। আমাদের শরীরে যেমন অসংখ্য রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে তেমনি আমাদের সমাজেও রয়েছে অজস্র রোগের বিস্তার ও বিচরণ। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যৌতুক রোগ। সংক্রামক ব্যাধির মতই যৌতুক রোগ বিভিন্ন জাতি ও সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে প্রবেশ করে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে ভয়ংকর বিভীষিকার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যৌতুক নামক প্রথা, রোগ, বিষবৃক্ষকে সমাজ থেকে সমূলে উৎপাটন করতে হলে যৌতুকের কারণ, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যৌবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই হচ্ছে যৌতুক রোগ। বিয়ের সময় কণ্যাপক্ষের অভিভাবক ইচ্ছে বা অনিচ্ছায় পাত্র পক্ষকে যে অর্থ সম্পদ, অলংকার, আসবাবপত্র দিয়ে থাকে তাকে যৌতুক বলে। আর এ উপঢৌকণ প্রদানের রেওয়াজকে বলা হয় যৌতুক প্রথা। আবার দেখা যায়, পাত্রকে চাকুরীর নিশ্চয়তা দিয়ে কিংবা বিদেশে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে কণ্যাকে পাত্রস্থ করা হয়। সেটাও যৌতুকের আওতাভুক্ত। কখনো দেখা যায় পাত্রকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যে কণ্যা পক্ষের অভিভাবক পাত্রকে লেখাপড়া শেখানোর যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিনিময়ে মেয়েকে পাত্রের নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান। বাস্তবিক পক্ষে সেটাও যৌতুক হিসেবে গণ্য হয়। কখনো বা মেয়ের বাবা জামাইকে শ্বশুড় বাড়ী যাতায়াতের জন্য গাড়ী কিনে দেন অথবা মেয়ের সুখ শান্তি নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য বাড়ি বানিয়ে দেন সেটাও একরকম যৌতুক হিসেবে ধরা হয়।

যৌতুক প্রথা অতি প্রাচীন প্রথা। তদানীন্তন হিন্দু সমাজে কণ্যাকে দশ/বার বছরের মধ্যে পাত্রস্থ বা বিয়ে দিতে না পারলে পুরুষ নরকবাসী হবেন বলে ভয় দেখানো হতো। এমন কি সমাজ চ্যূত করার বিধিও ছিল। হিন্দু সমাজে পিতা ও ভাতার সম্পদে কণের

অধিকার নেই বিধায় সনাতন বা হিন্দু ধর্মের বিধি বিধান থেকেই যৌতুক প্রথার প্রচলন হয়ে পড়ে। অর্থ ছাড়া জীবন অচল সত্য কিন্তু অতিরিক্ত অর্থলিপ্সা হতেই যৌতুকের সৃষ্টি। যৌতুকের সূচনা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সূত্রপাত হলেও মুসলিম সমাজের শিরায় শিরায় আজ যৌতুক প্রথা স্থায়ী আসন দখল করেছে। যৌতুক যেন অঘোষিত বিধানে পরিণত হয়েছে।

যৌতুকের নীল দংশনে দংশিত হচ্ছে নববধু। আগুন জ্বলছে স্বামী গৃহে। ভস্ম হচ্ছে সাজানো গোছানো মনের মতো সংসার। যৌতুকের কারণে কত কুমারী নারীর স্বপ্নের মেহেদি রঙ মুছে গেছে, কত অসহায় পিতা মেয়েকে বিয়ে দিতে না পারার অক্ষমতায় আত্মহত্যা করেছে অথবা মেয়ে পিতার অবস্থার কথা বিবেচনা করে আত্মহত্যা করেছে তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই । প্রতি দিন পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলে এর সত্যতা কতটুকু উপলদ্ধি করা যায়। মিডিয়া কর্মী, সাংবাদিক, অনুসন্ধান কর্মী বিশেষজ্ঞদের অগচরেই থেকে যায় কত ঘটনা। যৌতুক যেন সভ্যতার ললাটে এঁকে দিয়েছে কলঙ্কের পদচিহ্ন।
নারী চিরকালই কোমলমনা, সুশীলা। নীরবে নিভৃত্যে সহ্য করে শ্বশুড় বাড়ীর অমানবিক নির্যাতন। অত্যাচার, অনাচার, উপহাস, অবজ্ঞা, অবহেলা যেন তাদের নিত্য জীবন যাপনের সঙ্গী। শারিরিক মানসিক যন্ত্রণা যেন তাদের অদৃষ্টের লিখন। ভাবলে অবাক হয়ে যায়!! কি অসহায় আত্মসমর্পণ। মুখবুজে আঁচলের আড়ালে স্রষ্টার দরবারে কান্নার সান্তনা বেঁচে থাকার পাথেয়। প্রতিবাদের ভাষা যেন নারী রপ্ত করতে শিখেনি।

কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে যে নারী প্রতিবাদ করতে পারে সে হয়ত কিছুটা অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যে বধু সহ্য করে সে হয় যৌতুকের বলি। কখনো দেখা যায় শারীরিক নির্যাতনে যখন কোন নারী মারা যায় সেটাকে আত্মহত্যার নামে চালিয়ে দেওয়ার জন্য মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয় অথবা সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুঁলিয়ে রাখা হয়। কখনো বা লাশটি পর্যন্ত গুম করা হয়। আশ্চর্য এই পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থান। নারী যেন এখানে ভোগের সস্তা পণ্য, নগণ্য প্রাণী। তারা পুরুষের স্বাধীনতার রশিতে বাধা, ইচ্ছে অনিচ্ছের কারাগারে বন্দী। তারা পুরুষের খেলার পুতুল, সংসারের স্বীকৃত দাসী। আমাদের দেশে এ যাবৎ যে সকল কুমারী নারী ও গৃহবধু আত্মহত্যা করেছে তার শতকরা নব্বই ভাগই যৌতুকের কারণে। যৌবনের মিস্টি মধুর বাতাস যখন একজন নারীর শরীরে স্পর্শ করে তখন হতেই ফুলের মত সে মেয়েটি বুকের সবুজ জমিনে স্বামী সংসারের রঙিন স্বপ্ন বুনতে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে স্বামীগৃহে তাকে হতে হয় দাসী, নির্যাতিতা নিপীড়িতা গৃহবধু। চালানো হয় অত্যাচারের স্টীম রোলার। আলতা রাঙা আলতো পায়ে, মেহেদী রাঙা কোমল হাতে পরিয়ে দেওয়া হয় দাসীত্বের বেড়ী। স্বামী-স্ত্রী'র মধুর সম্পর্ক হয়ে উঠে বেদনা বিধুর । নারীর মনে নির্মিত স্বপ্ন মিনার ভেঙ্গে হয় খানখান। বাসর শয্যা হয় নির্যাতন শয্যা। জীবন সংসার ফুলে ফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই চলে যেতে হয় অন্য জগতে। বুকের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েও যখন একজন নারী চির আপন হতে পারে না সংসারে তখন স্বামীর স্বর্গ সংসার হয় নরকযজ্ঞ।
নারীর অপরিসীম অপরিমেয় প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ-মায়া মমতা সবকিছুই যৌতুকের মত ভয়ংকর দানবের নিকট তুচ্ছ। যৌতুক প্রথার নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা ও নারী নিয়াতন আজকাল সর্বজন বিদিত। স্বামী বাড়ির লোভী দানবদের লোভের বাজেট যখন স্ত্রী তার বাপের বাড়ী হতে অণুমোদন করতে পারে তাহলে বউটা হয় খুব ভালো, ঘরের লক্ষ্মী। আর না পারলেই যত সমস্যা , যত বিপত্তি তখন বউটি হয় খারাপ, অলক্ষ্মী। তার প্রতিটি কথায় লাগে তেতো, বিষের মতো। নিস্পাপ নারী চরিত্রের উপর লেপন কলঙ্কের কাদা। শুরু হয়ে যায় দৈহিক ও মানসিক অকথ্য নির্যাতন নিপীড়ন। চলে হত্যার চক্রান্ত, খুনের পাঁয়তারা। নির্যাতন নিপীড় নের নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবিত হয়। কপালে জোটে অবজ্ঞা, উপহাস আর অবহেলা। তিরস্কারের তীক্ষ্ণ ছোঁড়া তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয় বুকের পাঁজর। রক্তাত হয় হৃদয়ের কোমল ভূমি। আর্শিবাদের পৃথিবী হয়ে উঠে অভিশাপের দলিল।

স্বপ্নের আকাশে মেঘ জমে, হয় বৃষ্টি। নিয়ে যায় সব ভাসিয়ে। ধীরে ধীরে মুক্তির উপায় হিসেবে বেছে নেয় আত্মহত্যা। যৌতুক প্রথার বিষ ক্রিয়ায় সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে অস্থিরতা, অশান্তি, ক্ষোভের বারুদ। ঘটছে সম্পর্কের অবণতি। ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা সমাজ রাষ্টে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাশাপাশি সামাজিক কাঠামোতে আঘাত করছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন ও ধ্বংস করে দিচ্ছে। রক্তের বন্ধন ও সামাজিক সম্পর্কে ধরছে ফাটল। নারীর মৌলিক মানবিক অধিকার হচ্ছে ক্ষুন্ন। এই যৌতুক প্রথাই হচ্ছে নারী নির্যাতনের প্রথম ধাপ। এটা অত্যন্ত অমানবিক ও জঘন্য প্রকৃতির সামাজিক নিয়ম।

একক কোন কারণে যৌতুক প্রথার উদ্ভব ঘটেনি। এর জন্য বহুবিধ কারণকে দায়ী করা যায়। যেমনঃ-

১। আইনের চোখে নারী পুরুষ সমান মর্যদার অধিকারী হলেও নারীকে নিম্ন সামাজিক মর্যাদার কারণে সমাজে যৌতুক প্রথার বিস্তার ঘটেছে।
২। দারিদ্র্যতার নিষ্ঠুর ছোবল হতে মুক্তির একটা মাধ্যম হিসেবে যৌতুকের বিকাশ ঘটেছে।
৩। অতিরিক্ত সম্পদ লাভের মানসিকতা হতে যৌতুকের সূত্রপাত হয়েছে।

৪। কণ্যার দৈহিক খুঁত, অধিক বয়স, সৌন্দর্য্যের বা রুপের অভাব প্রভৃতি কারণে কণ্যাপক্ষ যৌতুক দিয়ে বিয়েতে রাজি হন।
৫। প্রকৃত শিক্ষার আলোক বিবর্জিত মানসিকতা যৌতুকের জন্য দায়ী।

৬। পাত্রের বাবার ব্যবসায়িক মনোভাবও যৌতুকের প্রসারে সহায়তা করে।
৭। কণ্যা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অত্যধিক স্নেহের কারণে মেয়ের সুখের জন্য জামাইকে অর্থ সম্পদ প্রদান করে যৌতুক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
৮। কন্যার চেয়ে বর বেশি উপযুক্ত হলে মেয়ের অভিভাবক মোটা অংকের যৌতুক প্রদান করে মেয়েকে পাত্রস্থ করে বিধায় যৌতকের প্রসার ঘটে।
এছাড়াও রয়েছে মেয়েদের সামাজিক নির্ভরতা- নির্ভরতার অভাব, অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হওয়ার বাসনা, সামাজিক নীতি, সামাজিক মূল্যবোধ, অনুকরণ প্রিয়তা, জামাই ক্রয়ের মনোভাব, হিন্দু সমাজের নীতি ঐতিয্যের বাড়াবাড়ি ইত্যাদি।

পুঁইডাটার মতো লকলকিয়ে বেড়ে উঠছে যৌতুক প্রথা এবং তা ছড়িয়ে পড়ছে সমাজের সর্বস্তরে। বিষাক্ত সাপের লালার মতই যৌতুক প্রথা দংশন করছে আমাদের সমাজকে আমাদের মূল্যবোধকে। ধনী, গরিব, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোন শাখাতেই এর কমতি নেই। শ্রেণীভিত্তিক যৌতুকের মূল্য নির্ধারিত হয়। সামাজিক, নৈতিক, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এই যুগে যৌতুক প্রথা যে কলংকের অধ্যায় রচনা করে চলেছে , অদুর ভবিষ্যতে এই প্রথার প্রতিরোধ করতে না পারলে আমাদের সচেতন বিবেকের কবর রচনা করতে হবে।
যৌতুক দেয়-নেয়া কোন ধর্মের বিধান নয়, যৌতুক চাওয়া আর ভিক্ষা চাওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আত্মর বন্ধনে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়, যৌতুকের বিনিময়ে নয়। যৌতুক পরিবারে ভাঙ্গনের বাঁশি বাজায়, যৌতুকের পরিণতি কখনো শুভ হয় না, যৌতুক কখনো মানসিক সুখ শান্তি দিতে পারেনা। যৌতুক চাওয়ার পূর্বে মনে রাখা উচিত আপনিও এক সময় মেয়ের পিতা হ বেন।

যৌতুক প্রথা সামাজিক কুসংস্কার ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। ক্ষয়রোগের মতই যৌতুক প্রথা আমাদেরকে মননশীল বিবেক বোধের অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। যৌতুক আত্মমর্যাদাকে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়। যৌতুক চাওয়া মানে নিজের অক্ষমতার নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ। বিনাশ্রমে অন্যের সম্পদ পাওয়া গৌরবের নয় বরং লজ্জার ও ঘৃণার, অপমান ও অবহেলার, বঞ্চনার ও অবজ্ঞার। যৌতুকের বিনিময়ে শুধু পাত্রই না, পাত্রের পরিবার প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সবাই, পাত্রী ও পাত্রীর পরিবারের নিকট বিক্রি হয়ে যায়। এর চেয়ে ঘৃণা, লজ্জা আর অপমানের বিষয় খুব কমই আছে।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি, এটি মানবতা বিরোধী কুপ্রথা। এই স্বীকৃত মনুষ্য কুপ্রথা নির্মুলে আমরা নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। যেমনঃ-

ক। সরকারী ও বে-সরকারীভাবে সমন্বিত উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারি।
খ। ১৯৮০ সালের যৌতুক বিরোধী আইনের প্রয়োগ ঘটাতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন পাস ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
গ। অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে।
ঘ। শিক্ষিত যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।
ঙ। পেপার পত্রিকায় যৌতুক বিরোধী প্রতিবেদন ছাপাতে হবে।
চ। সমাজ থেকে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অজ্ঞনতা দূর করে শিক্ষার আলো ছড়াতে হবে।
ছ। অর্থ-সম্পদের প্রতি তীব্র লোভ পরিহার করতে হবে।
জ। পাঠ্যপুস্তকে যৌতুক বিষয়ক প্রবন্ধ অন্তভুর্ক্ত করতে হবে।
ঝ। মাদ্রাসা, মসজিদ তথা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলোতে হুজুর ইমামদের যৌতুকের কুফল তুলে ধরতে হবে।
ঞ। যৌতুক দেওয়া নেওয়া সামাজিক অপরাধ সেটা জনগণকে অবহিত করতে হবে।
ট। হীন যৌতুক প্রথা বন্ধের জন্যে সভা-সেমিনার করতে হবে।
ঠ। মানবিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।
ড। নারী শিক্ষার প্রসার ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
ঢ। মিডিয়া ও গণমাধ্যমের দায়িত্ব সচেতনতা বাড়াতে হবে।
ণ। সকলের সাহায্য সহযোগিতা আর ঐক্যের একই প্লাটফর্ম তৈরি করতে হবে।

এছাড়াও নারীদেরকে ভোগ উপভোগের পণ্য কিংবা দাসী না ভেবে অর্ধাঙ্গনী ভাবতে হবে, নারী পুরুষ সমমর্যদার অধিকারী মনে করতে হবে এবং যৌতুক দেব না যৌতুক নেব না এই মন মানসিকতা বাস্তবে রুপান্তরিত করতে হবে। লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের যৌতুক বিরোধী লেখা প্রকাশ করতে হবে ইত্যাদি।

মানুষের মধ্যে যতদিন সামাজিক, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হবেনা ততদিন সমাজ থেকে যৌতুকের মতো মহামারী রোগকে নির্মূল করা সম্ভব হবে না। সকলের সাহায্য , সহযোগিতা আর সহমর্মিতায় যৌতুকের মতো সমাজ স্বীকৃত মহাজঘণ্য, নিন্দিত, অভিশপ্ত, দৈন্যদশা গ্রস্থ সমাজের কলংকময় অধ্যায়কে চিরতরে বিদূরিত করা সম্ভব। ভিক্ষাবৃত্তি আর যৌতুক প্রথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যৌতুক প্রথার অর্থ লালসার কাছে তুচ্ছ করে দিয়েছে নারী মনের স্বাভাবিক আবেদন, প্রেমের পরম পাওয়াকে নস্যাৎ করেছে তুচ্ছ বানিজ্যিক লেনদেন করে। এই যৌতুক প্রথা সৃষ্টি করছে শত্রুতা, ভেঙ্গে দিচ্ছে পারিবারিক স্নেহের বন্ধন, সৃষ্টি করছে সামাজিক অশান্তি, নিয়ে যাচ্ছে আদালতে, দাঁড় করাচ্ছে কাঠগড়ায়। নববধূর বাসর শয্যাকে করছে এলোমেলো, সৃষ্টি করছে নতুন নতুন ট্রাজেডী, কলংকিত করছে সমাজ, দেশ ও জাতিকে। এই লজ্জাজনক এমন কি অপরাধ মূলক ঘৃণ্য নিন্দিত যৌতুক প্রথার চির অবসান হোক এটাই আমাদের জাগ্রত বিবেকের একান্ত কামনা।

যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৯ নং আইন)

যেহেতু বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে যৌতুক গ্রহণ বা প্রদান নিরোধ সংক্রান্ত আইন DowrProhibition অপঃ, ১৯৮০ (Act no. XXXV of ১৯৮০) রহিতমর্মে উহার বিধানাবলী বিবেচনা করিয়া সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল : -

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ১

(১) এই আইন যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞাঃ

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে,

(ক) ''পক্ষ'' অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিবাহের বর বা কনে অথবা বর বা কনের পিতা-মাতা অথবা বর বা কনের পিতা-মাতার অবর্তমানে বৈধ অভিভাবক অথবা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সহিত জড়িত বর বা কনে পক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তি; এবং

(খ) ''যৌতুক'' অর্থ বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষের নিকট বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ অব্যাহত রাখিবার শর্তে, বিবাহের পণ বাবদ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, দাবিকৃত বা বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষেকে প্রদত্ত বা প্রদানের জন্য সম্মত কোনো অর্থ-সামগ্রী বা অন্য কোনো সম্পদ, তবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়াহ্) প্রযোজ্য হয় এমন ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে দেনমোহর বা মোহরানা অথবা বিবাহের সময় বিবাহের পক্ষগণের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা শুভাকাঙ্খী কর্তৃক বিবাহের কোনো পক্ষকে প্রদত্ত উপহার-সামগ্রী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

যৌতুক দাবি করিবার দন্ড ঃ

৩। যদি বিবাহের কোনো এক পক্ষ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বিবাহের অন্য কোনো পক্ষের নিকট কোনো যৌতুক দাবি করেন, তাহা হইলে উহা হইবে এই আইনের অধীন একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কিন্তু অন্যূন ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ, ইত্যাদির দন্ড

৪। যদি বিবাহের কোনো এক পক্ষ যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করেন অথবা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করেন বা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুক্তি করেন, তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কিন্তু অন্যূন ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

যৌতুক সংক্রান্ত চুক্তি ফলবিহীনঃ

৫। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ সংক্রান্ত কোনো চুক্তি ফলবিহীন (oid) হইবে।

মিথ্যা মামলা দায়ের, ইত্যাদির দন্ডঃ

৬। যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে মামলা বা অভিযোগ করিবার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনঅযোগ্যতা, ইত্যাদিঃ

৭। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং আপোষযোগ্য হইবে।

অপরাধের বিচার, ইত্যাদিঃ

৮। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act No. V of ১৮৯৮) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

বিধি প্রণয়ন ক্ষমতাঃ

৯। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

রহিতকরণ ও হেফাজতঃ

১০। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে Dowry Prohibition Act, ১৯৮০ (Act No. XXXV of ১৯৮০) অতঃপর উক্ত অপঃ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অপঃ এর অধীন দায়েরকৃত কোনো মামলা বিচারাধীন থাকিলে বা কোনো মামলা তদন্তাধীন বা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন উক্ত অপঃ রহিত হয় নাই।

ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশঃ

১১। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইন ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

সহায়কের জন্য নোট

অধিবেশন ০৩- শিরোনামঃ তালাক

আলোচ্য বিষয়:

- তালাক কি?
- তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের উপায়
- তালাকে নোটিশ প্রদানের গুরুত্ব
- তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর নিকট স্ত্রীর পাওনা

উদ্দেশ্য:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

ক. তালাক কি এই সম্পর্কে জানতে পারবেন
খ. তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের উপায় সমূহ জানতে পারবেন
গ. তালাকে প্রদানের ক্ষেত্রে নোটিশের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন
ঘ. তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর নিকট স্ত্রীর পাওনা আদায়ের নিয়ম আইনগত দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন

পদ্ধতিঃ আলোচনা , মুক্ত চিন্তার ঝড়, প্রশ্নোত্তর

উপকরণ: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টি মিডিয়া, ভিপ কার্ড এবং প্রজেক্টর

সময়: ৩০ মিনিট

প্রক্রিয়া:

- সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা শুরু করুন
- তালাক বলতে কি বুঝায় এই সম্পর্কে জানতে পারবেন
- তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের বিভিন্ন উপায় সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন। কি কি উপায়ে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ করা যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- তালাকে দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন নোটিশ প্রদান করতে হয় এবং এই নোটিশ প্রদান করার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- তালাকের পর স্বামীর নিকট স্ত্রীর পাওনা আদায়ের নিয়ম-কানুন এর আইনগত দিক সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- প্রতিটি শেষনে অংশগ্রহণকরীদের মতামত যাচাই করুন
- সবাইকে মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন

অধিবেশন - ০৩: তালাক

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বিয়ের মাধ্যমে স্থাপিত সম্পর্ককে আইনগত উপায়ে ভেঙ্গে দেয়াকে তালাক বা বিয়ে বিচ্ছেদ বলে। আইনের দৃষ্টিতে বিয়ে একটি চুক্তি। এর রয়েছে ধর্মীয় ও সামাজিক ভিত্তি। আইন অনুযায়ী একটি বিয়ের যে কোনো পক্ষ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে। যাকে আমরা বিবাহ বিচ্ছেদ বলি।

বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী সবারই সমান অধিকার রয়েছে। যদিও আমাদের একটি প্রচলিত ধারনা আছে যে কেবল স্বামীরাই তালাক দিতে পারে। যেকোনো সময় স্বামী চাইলেই তালাক দিতে পারে এমন ধারনাই প্রচলিত। দাম্পত্য সম্পর্ক টিকে থাকে স্বামীর মেজাজ-মর্জির ওপর। স্বামী যে ক'দিন চাইবে সে ক'দিন স্ত্রী ঘর-সংসার করবে। স্বামীর মন চাইলেই আউট। এই ধারণা সমাজে প্রচলিত থাকলেও তা আইন ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে বেআইনী। আইনে যদিও তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকার বেশি। তার মানে এই নয় যে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার কোনো অধিকার নেই। স্ত্রী বা স্বামীকে কিছু আইনগত শর্ত পালন করতে হয়। এ শর্তগুলো পালন করলেই তালাকের প্রশ্ন আসে। স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়া অধিকার প্রদাান করতে পারে। একে আইনের ভাষায় তালাক-ই-তৌফিজ বলা হয়। অর্থাৎ স্ত্রীও তার স্বামীকে তালাক প্রদান করতে পারে। আমাদের দেশে যতো তালাক হয় তার অধিকাংশই অন্যায়ভাবে ও আইন না মেনে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের ওপর দোষ চাপিয়ে তালাক নামক অস্ত্রটি প্রয়োগ করা হয়। যার পুরো সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীর্য় দায় বহন করতে হয় একজন নারীকে।

স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেয়া একজন স্বামীর আইনগত দায়িত্ব। তালাক হয়ে গেলে স্ত্রীর ভরণপোষণ দেয়া স্বামীর ওপর বর্তায় না। প্রায় সব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে এটাই প্রচলিত আইন ও রীতি। তালাকের পর নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। সে সময় পার হলে স্ত্রীকে ভরণ পোষণ দেয়া স্বামীর দায়িত্বের মধ্যে পড়েনা।

কিন্তু ১৯৮৫ সালে ভারতের একটি মামলার (মো: আহমেদ খান বনাম শাহ বানু বেগম) রায়ে বলা হয়, একদজন নারী পুন:বিবাহ না করা পর্যন্ত ভরণপোষণের অধিকার পাবে। এটি মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একই মতামত আমরা দেখি বাংলাদেশের একটি মামলায় (মো: হেফজুর বহমান বনান সামছুন নাহার বেগম) যেখানে একজন নারী তালাকপ্রাপ্তা হিসেবে যতদিন পরিচিত থাকবেন (অর্থাৎ আবার বিয়ে না করবেন) ততোদিন পর্যন্ত ভরণপোষণ পাবেন। পরবর্তীতে (১৯৯৮ সালে) হাইকোর্টের এ আদেশটি আপিল বিভাগ খারিজ করে দেয়। পবিত্র কুরআনের সুরা বাক্বারার ২৪১ নং আয়াতের যে ব্যাখ্যা হাইকোর্ট দিয়েছে তা গ্রহণ করেনি আপিল বিভাগ। তবে, অন্য কয়েকটি দেশে অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে তালাক দিলে সেক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভরণপোষণ দেয়ার বিধান আছে।

অন্যায় ও বেআইনীভাবে কোনো নারীকে যদি তালাক দেয়া হয় সে ক্ষেত্রে ইদ্দত সময়ের বাইরেও ওই নারী যতদিন পূন:বিবাহ না করেন ততদিন ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী। পাকিস্তান, মালয়েশিয়ায় এরকম বিধান আছে। পাকিস্তানের ২০০৯ সালের সংশোধিত পারিবারিক আইন ও মালয়েশিয়ার ১৯৮৪ সালের আইনে এই বিধান আছে। এছাড়া ইরাক, মিশর, জর্ডান, তুরস্কেও এ বিধান আছে। তবে সব দেশে যে বিধানটি একই রকম তা নয়। এ জাতীয় ভরণপোষণ দিতে হয় দুই বছর পর্যন্ত আবার কোথাও বাসস্থানের ব্যবস্থাও করে দিতে হয়।

আমাদের এখানে বিবাহ ও তালাক সম্পর্কিত আইন হলো মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১। এ আইনের ৭ ধারায় তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে।

এখানে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে, তিনি যে কোনো পদ্ধতির তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে নোটিশ দিবেন এবং স্ত্রীকে উক্ত নোটিশের একটি কপি প্রদান করবেন। কোনো ব্যক্তি যদি নোটিশ না দেয় তাহলে তিনি এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। কোনো তালাক যদি প্রত্যাহার করা না হয়, তাহলে চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ প্রদানের তারিখের নব্বই দিন পর তা কার্যকর হবে।

তবে, তার আগে নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে একটি সালিশী পরিষদ গঠন করবেন এবং উক্ত সালিসী পরিষদ এই জাতীয় পুনর্মিলনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিষয়টি যদি সমাধানযোগ্য হয়, তবে তার সমাধান করতে হবে। এটিই মূলত চেয়ারম্যান বা কমিটির কাজ। চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদানের কারণ এটাই।

একই আইনের ৯ ধারায় আছে, কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে পর্যাপ্ত ভরণ-পোষণ বা খোরপোষ দানে ব্যর্থ হলে বা একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে তাদেরকে সমান খোরপোষ না দিলে, স্ত্রী বা স্ত্রীরা চেয়ারম্যানের কাছে দরখাস্ত করতে পারেন। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সালিশী পরিষদ গঠন করবেন এবং ঐ পরিষদ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ প্রদানের জন্য টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে সার্টিফিকেট জারী করবেন। স্বামী যদি ভরণপোষণের কোনো টাকা যথাসময়ে বা সময়মত পরিশোধ না করে তাহলে তা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে তার কাছ থেকে আদায় করা হবে।

ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইন

ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিধিবিধান জানার আগে ভরণপোষণ কি সেটা আমাদের জানা দরকার। ভরণপোষণ হলো মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা।

একজন সক্ষম এবং উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার স্ত্রী, নাবালক ছেলে-মেয়েদের ভরণপোষণ দিতে সবসময়ই বাধ্য।

স্ত্রীর ভরণপোষণঃ

আমরা এটা অনেকেই জানি যে মুসলিম বিয়ে একটি দেওয়ানি চুক্তি। এই চুক্তির ফলে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস ও সংসার পালন করেন। বিয়ের ফলে কিছু আইনগত অধিকার যেমনি সৃষ্টি হয় তেমনি কিছু দায়িত্বও সৃষ্টি হয়। এই দায়িত্বগুলোর মাঝে ভরণপোষণ অন্যতম ।

ভরণপোষণ হলো স্বামীর জন্য দায়িত্ব এবং স্ত্রীর জন্য অধিকার। বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য থাকা-খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা ও জীবনধারণের জন্য অন্যান্য যে যে উপকরন লাগবে স্ত্রী তা স্বামীর কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারী হন। এই অধিকার স্ত্রী যখন স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে তখন তো থাকবেই, তেমনি কোনো কারনে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরেও তা বলবৎ থাকবে।

তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে এটি একটি সীমিত অধিকার এবং সীমাবদ্ধ সময় পর্যন্ত বহাল থাকে। মুসলিম আইনে স্ত্রীর উপর স্বামীর ব্যাপারে কিন্তু একই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। কারণ ধরেই নেয়া হয় যে, বেশিরভাগ মেয়েরা বাবা বা স্বামীর ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল। যদিও বতর্মানে বাস্তবতা অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে কারণেই স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবেন কিন্তু স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো ভরণপোষণ পাবেন না।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে ভরণপোষণঃ

যদি কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেই যায় তাহলে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরও স্ত্রী কিছুদিন ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী হবেন। যেদিন থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ কার্যকরী হয় সেদিন থেকে ৯০ দিন।

বর্তমানে মুসলিম আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের দেশের আদালতগুলো বিশেষ করে উচ্চ আদালত উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। হিফজুর রহমান বনাম সামসুন নাহার বেগম এবং অন্যান্য (৪৭ ডি এল আর ১৯৯৫ পৃষ্ঠা ৫৪) মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত নেয় যে, “স্বামীর অবশ্যই তার তালাক প্রদানকারী স্ত্রীকে এমনভাবে ভরণপোষণ দিতে হবে যা তার জন্য প্রয়োজন, এমনকি ইদ্দতকালিন সময় পার হওয়ার পরেও এই যথাযোগ্য ভরণপোষণ দিতে হবে একটি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য যতদিন পর্যন্ত সেই তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর অন্য কোনো বিয়ে না হয়”। কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগের এই রায়কে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ দ্বারা রহিত করা হয়। এই একই মামলায় আপিল বিভাগ শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে কেবল তিন মাস (৯০ দিন) অর্থাৎ ইদ্দতকালিন সময় পর্যন্ত ভরণপোষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভরণপোষণ আদায়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীর আইনগত যে অধিকার রয়েছে ঃ

প্রথমত, ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ অনুযায়ী ভরণপোষণের জন্য স্ত্রীর মামলা করার অধিকার আছে। এটি একটি দেওয়ানি প্রতিকার। এই অধ্যাদেশে ভরণপোষণ, দেনমোহর, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পারিবারিক আদালতে মামলা করার কথা বলা হয়েছে। পূর্বে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮৮ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ভরণপোষণের মামলা দায়ের করা যেত। ২০০৯ সালে ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করে এই ধারাটি বাদ দেয়া হয়েছে। (সুত্রঃ বাংলাদেশ গেজেট, ৮ এপ্রিল ২০০৯)।

দ্বিতীয়ত, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৯ ধারায় বলা আছে, স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হলে স্ত্রী স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে এই বিষয়ে আবেদন করতে পারবেন। চেয়ারম্যান সালিশি পরিষদ গঠন করে ভরণপোষণের পরিমান ঠিক করবেন এবং সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন। স্বামী এরপরেও নির্ধারিত ভরণপোষণ না দিলে স্ত্রী বকেয়া ভুমি রাজস্বের আকারে তা আদায় করতে পারবেন।

যুক্তিসঙ্গত কারণগুলোর মাঝে হতে পারে যেমন- দেনমোহর আদায়ের জন্য আলাদা বসবাস অথবা স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণ, অত্যাচার বা ধর্ম পালনে বাধা প্রদানের কারণে আলাদা বসবাস ইত্যাদি আরও অনেক যুক্তিসঙ্গত কারণে আলাদা বসবাস করলেও স্ত্রী ভরণপোষণ পাবেন।

মুসলিম বিবাহ - বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯ অনুযায়ী স্বামী দুই বছর ধরে ভরণপোষণ প্রদানে ব্যর্থ হলে বা অবহেলা করে ভরণপোষণ না দিয়ে থাকলে স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী হবেন।

এক্ষেত্রে একটি মামলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মামলাটি হলো সাফুরা খাতুন বনাম ওসমান গনি মোল্লা (১৯৫৭) ৯ ডি এল আর, ৪৫৫। এই মামলায় বলা হয়েছিল যে, স্বামীর দেয়া ভরণপোষণ ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মতো । স্বামীর যে পরিমান ভরণপোষণ দেয়ার কথা ছিল, তার সামান্য পরিমান টাকা স্বামী পরিশোধ করত তাও আবার খুব অনিয়মিত। সুতারাং এক্ষেত্রে ধরা হবে যে, উক্ত স্বামী কাবিননামার শর্ত পালন করেননি এবং এ কারনেই স্ত্রী তালাক-ই-তৌফিজের ব্যাবহার করতে পারেন এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারেন।

সন্তানদের ভরণপোষণ:

সন্তানদের ভরণপোষণ দেয়ার দায়িত্ব আইনগতভাবে বাবার। সাবালক হওয়া পর্যন্ত ছেলেকে এবং বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মেয়েকে বাবা ভরণপোষণ দিবেন। কোনো অসুস্থ ও অক্ষম সন্তান থাকলে তাদের ভরণপোষণও দিবেন বাবা। সাবালকত্ব অর্জন করার পরেও যদি সন্তানরা নিজ ভরণপোষণ যোগাতে ব্যর্থ হন তবে আইন অনুসারে ঐ সন্তান বাবার কাছে ভরণপোষণ দাবি করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে বাবা ভরণপোষণ দিতে বাধ্য নন। মা যখন সন্তানের জিম্মাদার তখনও বাবা ভরণপোষণ দিবেন।

সহায়কের জন্য নোট

অধিবেশন ০৪- শিরোনাম ঃ নারী / শিশু নির্যাতন ও যৌন হয়রানি

আলোচ্য বিষয়:

- নারী ও শিশু নির্যাতন বলতে কি বুঝি
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের উপায়
- নারী ও শিশু নির্যাতন হলে করণীয়

উদ্দেশ্য:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

ক. নারী ও শিশু নির্যাতন বলতে কি বুঝি এ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে পারবেন
খ. বিভিন্ন ধরণের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের উপায়সমুহ সম্পর্কে জানতে পারবেন
গ. নারী ও শিশু নির্যাতন হলে করণীয় কি এই সম্পর্কে জানতে পারবেন

পদ্ধতি ঃ আলোচনা, মুক্ত চিন্তার ঝড় ও প্রশ্নোত্তর
উপকরণ : অভিনয় ও প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় উপকরন
সময়: ৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া:

- সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা শুরু করুন
- নারী ও শিশু নির্যাতন বলতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- বিভিন্ন ধরণের নারী ও শিশু নির্যাতন বলতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন ও এর প্রতিরোধের উপায়সমুহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন
- নারী ও শিশু নির্যাতন হলে করণীয় কি এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন
- সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন

পদক্ষেপ - ০৪: নারী / শিশু নির্যাতন ও যৌন হয়রানি ঃ

আমরা পারিবারিক অশান্তি বা সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ যেখানে- সেখানে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব নিয়ে ভাবার সুযোগ কোথায়? তবে কিছু মানুষ অবশ্যই ভাবছেন সীমিত বিষয় নিয়ে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা তাই বলে। অথচ তাকালেই দেখি ধ্বংস, ক্ষয় আর নির্মমতার ঘটনাবহুল দিন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতিও রক্ষা করতে পারছে না মানুষ নামের প্রাণী ও তার আবাসভূমিকে ধ্বংস, ক্ষয় আর চরম নির্মমতার হাত থেকে। আমরা প্রতিনিয়ত পৈশাচিক আর হৃদয়বিদারক ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছি। সমাজ অভ্যন্তরে চলছে গভীর সঙ্কট। নীতি আদর্শ এবং মূল্যবোধ হারিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছে জাহেলিয়া যুগের পশুবৃত্তি ও জিঘাংসা প্রবন। খুন, গুম, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মানবতাকে পদদলিত করে চলেছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুর প্রতি নৃশংসতা ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে।

মানুষকে বলা হয় **'আশরাফুল মাখলুকাত'** অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই মানুষের আচরণ হওয়া উচিত অন্যান্য জীবের চেয়ে স্বতন্ত্র। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, 'আমি মানব জাতিকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি'। অথচ সে মানুষই আজ দানবের মতো আচরণ করছে। দেশের কোথাও না কোথাও হত্যা, ধর্ষণ, ইভটিজিং ও আত্মহননের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক হারে ঘটে চলেছে। তুচ্ছ ঘটনায়ও মানুষ খুন হচ্ছে, খুন হচ্ছে আদালত কক্ষে বিচারকের সামনে। হত্যার পাশাপাশি আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে ধর্ষণ। ধর্ষকদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না ছয়-সাত বছরের মেয়েশিশু কিংবা ছয় মাসের কোলের শিশু। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য মতে, ২০১৯ সালের প্রথম ছয় মাসে মোট ৪৯৬ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। আইন ও সালিস কেন্দ্রের নিয়মিত মানবাধিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- ২০১৯ সালের প্রথম ছয় মাসে ধর্ষণের ঘটনা ছিল ৬৩০টি। ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টায় শিশু হত্যার ঘটনা ঘটে ২১টি। ধর্ষণের শিকার শিশুদের মধ্যে বেশির ভাগ শিশুর বয়স সাত থেকে ১২ বছরের মধ্যে। বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ২০১৮ সালে সারা দেশে ৪৩৩টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের কারণে একই বছর প্রাণ হারায় ২২ শিশু। এ ছাড়াও ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয় ৫৩ শিশুর ওপর। যৌন নির্যাতনে একটি শিশু মারা যায়। ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, হত্যা ও শারীরিক নির্যাতনে মারা গেছে ২৭১ শিশু। বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে আরো এক হাজার ছয়জন।

যে বয়সে শিশুদের স্কুলে যাওয়ার কথা, সে বয়সে তাদের দেখা যায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) জরিপ মতে, কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ৪৫ ধরনের কাজের মধ্যে ৪১ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুরা কর্মরত। পেটের দায়ে শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে থাকলেও ছোটখাটো ভুলের জন্য নির্যাতনের শিকার হতে হয়। বিশ্ব বরেণ্য বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক রাষ্ট্রপতি নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, 'সমাজ কিভাবে শিশুদের প্রতি আচরণ করে তার মধ্য দিয়ে সমাজের চেহারা ফুটে উঠে'। বর্তমানে আমাদের সমাজে যে ধরনের নিষ্ঠুরতা ও যৌন উন্মাদনা চলছে, তা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। নারী ও শিশুদের ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা বেড়েই চলেছে। যেভাবেই ধর্ষণ হোক না কেন, তা গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ। বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৭৫ ধারা অনুযায়ী কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সম্মতি ছাড়া, ভয় প্রদর্শন করে, প্রতারণার মাধ্যমে এবং ১৪ বছরের কম বয়সী বালিকার সাথে সহবাস করলে (ব্যক্তি বা দল) ধর্ষণ করেছে বলে গণ্য হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯ ধারা মোতাবেক, ধর্ষণের ফলে যদি কোনো নারী বা শিশুর মৃত্যু হয়, তাহলে ধর্ষণকারীর জন্য রয়েছে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড। উপরন্তু কমপক্ষে এক লাখ টাকার অর্থদন্ড। দলগতভাবে নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করলে ধর্ষণকালে কিংবা ধর্ষণের পর মৃত্যু হলে তবে ওই দলের সবাইকে উল্লিখিত শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেউ ধর্ষণের চেষ্টা করলে তার জন্য সর্বোচ্চ ১০ বছর এবং সর্বনিম্ন পাঁচ বছরের কারাদন্ডসহ অতিরিক্ত অর্থদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। তবুও দুর্বৃত্তরা ক্ষান্ত হচ্ছে না। আইন ও সালিস কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে তিন হাজার ৫৮৭ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। একই সময়ে পুলিশ সদর দফতরে মামলা হয়েছে ১৯ হাজারের অধিক। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ১১টি ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলা হয়েছে। তবে আসামিদের মাত্র তিন শতাংশের সাজা হয়েছে। শাস্তির আওতায় আসা আসামিদের এ সামান্য হারেই ধর্ষকদের বেপরোয়া করে তুলছে বলে বিজ্ঞজনদের অভিমত।

গত ১২ জুলাই একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, 'অনেক ঘটনাই নতুন আরেক জঘন্য ঘটনার চাদরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কেবল সেই সব জঘন্য ঘটনার বিচার হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে যেগুলোর ব্যাপারে একযোগে মিডিয়া, সরকার ও সুশীলসমাজ সমানভাবে সোচ্চার হচ্ছে। গণমাধ্যম সোচ্চার হলে প্রশাসন ও নাগরিক সমাজ দৌড়ঝাঁপ করে, কিন্তু বেশির ভাগ ঘটনা ওভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। এ ধরনের ঘটনার সাথে বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও ক্ষমতার রাজনীতির সংযোগ রয়েছে। আজ অত্যন্ত বেদনাদায়ক এক ভয়াবহ সময়ে আমরা উপনীত হয়েছি। ঢাকাসহ দেশের সব শহরের অলিতে গলিতে

বিশেষত রেললাইনের আশপাশে হতাশা, বেকারত্ব, অসৎ সঙ্গ ও পারিবারিক অশান্তির কারণে মানুষ নেশায় আচ্ছন্ন। ইয়াবা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য টেকনাফ

এবং পার্বত্যাঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঢুকে পড়ছে। যার ফলে ধর্ষণ ও ধর্ষণ-পরবর্তী খুন-গুমের মতো অন্যান্য অপরাধ বেড়ে চলেছে।

সূরা আল কেয়ামায় মহান আল্লাহ সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, ‘মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি বেহিসাব ছেড়ে দেয়া হবে’? ‘আহকামুল হাকেমিন’ সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ বিচারক। এ বোধ, জ্ঞান ও অনুভূতি যার অন্তরে সে ধর্ষণ, খুন, গুম, অন্যায়, অবিচার করতে পারে না। পারে না নীতিশূন্য হতে। অন্য দিকে আল্লাহ্ ভীতি যার অন্তরে নেই, পরকালে জবাবদিহিতার ভয় নেই তার কাছে তো সুনীতি-দুর্নীতি, ন্যায়-অন্যায় কিংবা ভালো-মন্দ সমান। ওই যে পরকালের জবাবদিহিতার ভয়ে মানুষ অপকর্ম পরিহার করে, তাই ধর্ম। কেন না, কোনো ব্যক্তি যদি চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাস, আচার-আচরণে পরকালের সংশ্লিষ্টতা রাখেন, তাহলে সে ধর্মহীন হতে পারে না। ধর্ম মানুষের আদিমতম আইন, ধর্মই মানুষকে নীতিশূন্য হতে বাধা দেয়। সুতরাং সময় থাকতে আমাদের পাঠশালা, বিদ্যানিকেতন সর্বত্র নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর তালিম বা শিক্ষাদান করলে শিশু ও নারীর ওপর পাশবিকতা বা নির্যাতন অবসানের আশা করা যায়।

নির্যাতন রোধে চাই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তন আনতে হবে। নির্যাতনের ধরন অনুযায়ী আইনের কার্যকর প্রয়োগ, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ নির্যাতন প্রতিরোধে বড় ভূমিকা রাখতে পারবে।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে হবে। নারী নির্যাতন শুধু নারীর বিষয় নয়, এটা সমাজের বিষয়। প্রত্যেককে যার যার পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কাজ করতে হবে। মেয়েদেরও নিজের প্রতি আস্থা রাখতে হবে, নিজের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে।

২০১৮ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ৬৬ শতাংশই পারিবারিক সহিংসতা। এর মধ্যে মাত্র ১১ শতাংশ ঘটনায় আইনি প্রতিকার চাওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৬৪ শতাংশ নারী অনলাইনে নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য তানিয়া হক বলেন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ও করণীয় নির্ধারণে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। পুরুষতন্ত্র শুধু নারীকে নয়, পুরুষকেও কীভাবে শারীরিক ও মানসিক চাপে ফেলে এবং নারী নির্যাতনের কারণে পুরুষকেও কীভাবে ব্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়, সেটা তুলে ধরতে হবে।

ইউএন উইমেনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি গীতাঞ্জলি সিং বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে তাঁর মনে হয়েছে, এখানে নারী নির্যাতন বন্ধে নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যথাযথ তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন, যাতে কোন ধরনের সহিংসতা বেশি হচ্ছে, তা জানা যায় এবং সে অনুযায়ী প্রতিরোধব্যবস্থা নেওয়া যায়। আইন ঠিকভাবে সুরক্ষা দিচ্ছে কি না, সেটাও পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

ঢাকা মহানগর পুলিশের সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম ডিভিশনের (সাইবার ও বিশেষ অপরাধ বিভাগ-দক্ষিণ) অতিরিক্ত উপকমিশনার নিশাত রহমান মাঠপর্যায়ে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, অনলাইনে সহিংসতা এড়াতে মেয়েদের একটু বেশি সচেতন হতে হবে। অনেক মেয়ে স্বামী ও প্রেমিককে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড দিয়ে দেয়। ঘনিষ্ঠ ছবি দেয়। সম্পর্কের অবনতি হলে এই ছবিগুলো ওই ব্যক্তিরা নারীটির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক (মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) নূরুন নাহার বেগম বলেন, পরিবার ও সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নারী নির্যাতন শূন্য রাখার ঘোষণা থাকতে হবে ও তা পালন করতে হবে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও যৌন-প্রজননস্বাস্থ্য শিক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টিতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমীন বলেন, আইনে পারিবারিক নির্যাতনকে এখনো অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষার আইনটি একধরনের নাগরিক প্রতিকার দেয়। ফলে অনেক সময় আইনজীবীরা পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনায় যৌতুকের মামলা দেন। অনেক সময় তা প্রমাণও করা যায় না। এভাবে

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে করা অনেক মামলা মিথ্যা বলে অপবাদে পড়ে। যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধে আইন প্রণয়নে বাধা দূর, আইন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার ও মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অভিনয়শিল্পী আজমেরী হক বাঁধন বলেন, নারীবিদ্বেষী বিষয়বস্তুকে পুঁজি করে অনেক সময় চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়ে থাকে, যা একটি ভয়াবহ প্রবণতা। এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা না করার জন্য গণমাধ্যমের সচেতনতামূলক প্রচার চালানো জরুরি।

বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের ফাস্ট বোলার জাহানারা আলম বলেন, খেলাধুলা তাঁর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। তিনি প্রতিবাদ করতে শিখেছেন। নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেই সবাই মিলে সোচ্চার হওয়া উচিত।

ইউনিলিভারের করপোরেট অ্যাফেয়ার্স পার্টনারশিপ অ্যান্ড কমিউনিকেশনের পরিচালক শামীমা আক্তার বলেন, কোভিডের সময় বিশ্বজুড়ে পারিবারিক নির্যাতন বেড়ে যাওয়ায় নিজেদের কর্মীদের সহায়তার জন্য ২০২০ সাল থেকে ইউনিলিভার একটি নীতি অনুসরণ করছে। ওই নীতি অনুসারে, কোনো কর্মী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হলে তিনি বাড়ির বাইরে থাকা, আইনি লড়াই ও মনোসামাজিক সহায়তাসহ ৯০ দিনের সহযোগিতা পাবেন।

প্রথম আলোর ইংরেজি ওয়েবের প্রধান আয়েশা কবির গণমাধ্যমের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন, নারীর বিষয়গুলো গণমাধ্যমে বিস্তারিত ও বড় পরিসরে প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেসট্রাস্টের (ব্লাস্ট) জ্যেষ্ঠ অ্যাডভোকেসি কর্মকর্তা আয়শা আখতার কিছু অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, সাক্ষ্য আইনে আদালতের অনুমতি ছাড়া ধর্ষণ বা ধর্ষণচেষ্টা মামলায় জেরার সময় ভুক্তভোগীকে তার চরিত্র ও অতীত যৌন আচরণ নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না এমন বিধান যোগ করা হয়েছে।

মেয়ে নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা ও অগ্নি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট তৃষিয়া নাশতারান বলেন, মামলা করতে গিয়ে নারীরা যেন হয়রানির শিকার না হন, সেদিকে নজরদারি বাড়ানো উচিত।

একশনএইড বাংলাদেশের গার্লস লিড অ্যাকশন প্রজেক্টের প্রতিনিধি পূর্ণিমা ইসলাম বলে, সে নারায়ণগঞ্জের একটি স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ে। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ও প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করার সময় তাকে প্রায়ই বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়। তবে দমে না গিয়ে কাজ অব্যাহত রাখছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

(২০০০ সনের ৮ নং আইন)

যেহেতু নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ঃ

১। এই আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

সংজ্ঞা ঃ

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “অপরাধ” অর্থ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ;

(খ) “অপহরণ” অর্থ বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করিয়া বা ফুসলাইয়া বা ভুল বুঝাইয়া বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন স্থান হইতে কোন ব্যক্তিকে অন্যত্র যাইতে বাধ্য করা;

(গ) “আটক” অর্থ কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে আটকাইয়া রাখা;

(ঘ) “ট্রাইব্যুনাল” অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোন ট্রাইব্যুনাল;

(ঙ) “ধর্ষণ” অর্থ ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে, Penal Code, ১৮৬০ (Act XLV of ১৮৬০) এর Section ৩৭৫ এ সংজ্ঞায়িত "rape";

(চ) “নবজাতক শিশু” অর্থ অনূর্ধ্ব চল্লিশ দিন বয়সের কোন শিশু;

(ছ) “নারী” অর্থ যে কোন বয়সের নারী;

(জ) “মুক্তিপণ” অর্থ আর্থিক সুবিধা বা অন্য যে কোন প্রকারের সুবিধা;

(ঝ) “ফৌজদারী কার্যবিধি” অর্থ Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act V of ১৮৯৮); ১ (ঞ) “যৌতুক” অর্থ-

(অ) কোন বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সহিত জড়িত বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপুর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বিবাহের পণ হিসাবে বিবাহের কনে পক্ষের নিকট দাবীকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ; অথবা

(আ) কোন বিবাহের কনে পক্ষ কর্তৃক বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সহিত জড়িত বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপুর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বিবাহের পণ হিসাবে প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ;

(ট) “শিশু” অর্থ অনধিক ষোল বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি;]

(ঠ) “হাইকোর্ট বিভাগ” অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ

আইনের প্রাধান্য ঃ

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

দহনকারী, ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তিঃ

৪। (১) যদি কোন ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীকে এমনভাবে আহত করেন যাহার ফলে উক্ত শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয় বা শরীরের কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা তাহার শরীরের অন্য কোন স্থান আহত হয়, তাহা হইলে উক্ত শিশুর বা নারীর-

(ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট বা মুখমন্ডল, স্তন বা যৌনাংগ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকার অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;

(খ) শরীরের অন্য কোন অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার বা শরীরের কোন স্থানে আঘাত পাওয়ার ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যূন সাত বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ কোন শিশু বা নারীর উপর নিক্ষেপ করেন বা করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, তাহার উক্তরূপ কার্যের দরুণ সংশ্লিষ্ট শিশু বা নারীর শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে কোন

ক্ষতি না হইলেও, অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন অর্থদন্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ, বা তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় রাখিয়া যাওয়া সম্পদ হইতে আদায় করিয়া অপরাধের দরুণ যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে বা, ক্ষেত্রমত, যেই ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে।

নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি ঃ

৭। যদি কোন ব্যক্তি ৪ [মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) এর ধারা ৩ ও ৬ এ উল্লিখিত] কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা অন্যূন চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি ঃ

৮। যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটক করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, ইত্যাদির শাস্তি ঃ

৯। (১) যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি ৫ [মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে] দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা- যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত ৬[ষোল বৎসরের] অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা ৭[ষোল বৎসরের] কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ পরবর্তী তাহার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ৮[ধর্ষণের শিকার] নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন এবং ধর্ষণের ফলে উক্ত নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন, তাহা হইলে ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে-

(ক) ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ৯[মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে] দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;

(খ) ধর্ষণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(৫) যদি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ১০[ধর্ষণের শিকার] হন, তাহা হইলে যাহাদের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরূপ ধর্ষণ সংঘটিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ১১[ধর্ষণের শিকার] নারীর হেফাজতের জন্য সরাসরিভাবে ১২[দায়িত্বপ্রাপ্ত] ছিলেন, তিনি বা তাহারা প্রত্যেকে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য, অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন দশ হাজার টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা, ইত্যাদির শাস্তি ঃ

১৩ [৯ক। কোন নারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত (Wilful) কোন কার্য দ্বারা সমভ্রমহানি হইবার প্রত্যক্ষ কারণে কোন নারী আত্মহত্যা করিলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপ কার্য দ্বারা আত্মহত্যা করিতে প্ররোচিত করিবার অপরাধে অপরাধী হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

যৌন পীড়ন, ইত্যাদির দন্ড ঃ

১৪ [১০। যদি কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন বা কোন নারীর শ্লীলতাহানি করেন তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন।]

যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, ইত্যাদির শাস্তি ঃ

১১। যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন ১৫[কিংবা উক্ত নারীকে মারাত্মক জখম (grievous hurt) করেন বা সাধারণ জখম (simple hurt) করেন] তাহা হইলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি-

(ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদন্ড বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দায়ে অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন;

১৬[(খ) মারাত্মক জখম (grievous hurt) করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে অথবা অনধিক বার বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন;

(গ) সাধারণ জখম (simple hurt) করার জন্য অনধিক তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন।]

ভিক্ষাবৃত্তি, ইত্যাদির উদ্দেশ্যে শিশুকে অঙ্গহানি করার শাস্তি ঃ

১২। যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত, পা, চক্ষু বা অন্য কোন অংগ বিনষ্ট করেন বা অন্য কোনভাবে বিকলাংগ বা বিকৃত করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন।

ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধানঃ

১৭ [১৩। (১) অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধর্ষণের কারণে কোন সন্তান জন্মলাভ করিলে-

(ক) উক্ত সন্তানকে তাহার মাতা কিংবা তাহার মাতৃকুলীয় আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে রাখা যাইবে;

(খ) উক্ত সন্তান তাহার পিতা বা মাতা, কিংবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হইবার অধিকারী হইবে;

(গ) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহণ করিবে;

(ঘ) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় তাহার বয়স একুশ বৎসর পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রদেয় হইবে, তবে একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাহার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং পঙ্গু সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।

(২) সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন কোন সন্তানকে ভরণপোষণের জন্য প্রদেয় অর্থ সরকার ধর্ষকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে এবং ধর্ষকের বিদ্যমান সম্পদ হইতে উক্ত অর্থ আদায় করা সম্ভব না হইলে, ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হইবেন সেই সম্পদ হইতে উহা আদায়যোগ্য হইবে।

সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা-নিষেধঃ

১৪। (১) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হইয়াছেন এইরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তত্সম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোন সংবাদ পত্রে বা অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাইবে যাহাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায় ।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করা হইলে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে অনধিক দুই বৎসর কারাদন্ডে বা অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডীয় হইবেন ।

ভবিষ্যৎ সম্পত্তি হইতে অর্থদন্ড আদায় ঃ

১৫। এই আইনের ধারা ৪ হইতে ১৪ পর্যন্ত ধারাসমূহে উল্লেখিত অপরাধের জন্য ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপিত অর্থদন্ডকে, প্রয়োজনবোধে, ট্রাইব্যুনাল অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ হইতে আদায় করা সম্ভব না হইলে, ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হইবেন সেই সম্পদ হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের উপর অন্যান্য দাবী অপেক্ষা উক্ত অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণের দাবী প্রাধান্য পাইবে।

অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতিঃ

১৬। এই আইনের অধীনে কোন অর্থদন্ড আরোপ করা হইলে, ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টরকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা অনুরূপ বিধি না থাকিলে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অপরাধীর স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয়বিধ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় বা ক্রোক ছাড়াই সরাসরি নিলামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রাইব্যুনালে জমা দিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল উক্ত অর্থ অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের ইত্যাদির শাস্তি ঃ

১৭। (১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অন্য কোন ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান তাহা হইলে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি এবং যিনি অভিযোগ দায়ের করাইয়াছেন উক্ত ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এর অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও মামলার বিচার করিতে পারিবে।

বিচার পদ্ধতি ঃ

২০। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার কেবলমাত্র ২১[ধারা ২৬ এর] অধীন গঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।

(২) ট্রাইব্যুনালে মামলার শুনানী শুরু হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে একটানা চলিবে।

(৩) বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হইতে একশত আশি দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সময়সীমার মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে, ট্রাইব্যুনাল মামলার আসামীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে এবং আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া না হইলে ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবে।

(৫) কোন মামলার বিচারকার্য শেষ না করিয়া যদি কোনট্রাইব্যুনালের বিচারক বদলী হইয়া যান, তাহা হইলে তিনি বিচারকার্যের যে পর্যায়ে মামলাটি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পর্যায় হইতে তাহার স্থলাভিষিক্ত বিচারক বিচার করিবেন এবং তাহার পূর্ববর্তী বিচারক যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না:
তবে শর্ত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে যদি বিচারক কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করা অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে এমন যে কোন সাক্ষীকে তলব করিয়া পুনরায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।
২২[(৬) কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কিংবাট্রাইব্যুনাল স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করিলে এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন অপরাধের বিচার কার্যক্রম রুদ্ধদ্বার কক্ষে (trial in camera) অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।]
(৭) কোন শিশু এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে বা উক্ত অপরাধের সাক্ষী হইলে তাহার ক্ষেত্রে ২৩[শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন)] এর বিধানাবলী যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে।

২৪[(৮) কোন নারী বা শিশুকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখিবার আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রেট্রাইব্যুনাল, উক্ত নারী বা শিশুর কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার্থে তাহার মতামত গ্রহণ ও বিবেচনা করিবে।]

আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার ঃ
২১। (১) যদি ট্রাইব্যুনালের এই মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে,-
(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারের জন্য সোপর্দকরণ এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছে বা আত্মগোপন করিয়াছেন; এবং
(খ) তাহার আশু গ্রেফতারের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল অন্তত: দুইটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সময়, যাহা ত্রিশ দিনের বেশী হইবে না, এর মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিট্রাইব্যুনালে হাজির হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলেট্রাইব্যুনাল তাহার অনুপস্থিতিতে বিচার করিতে পারিবে।
(২) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির হইবার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে কর্তৃক জামিনে মুক্তি দেওয়ার পর পলাতক হন, তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না, এবং সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালে, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার সম্পন্ন করিতে পারিবে।

ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যে কোন স্থানে জবানবন্দি গ্রহণের ক্ষমতা ঃ
২২। (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের তদন্তকারী কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা তদন্তকারী অন্য কোন ব্যক্তি কিংবা অকুস্থলে কোন আসামীকে ধৃত করার সময় কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল বা ঘটনাটি নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তির জবানবন্দি অপরাধের ত্বরিত বিচারের স্বার্থে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লিখিতভাবে বা অন্য কোনভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন।
(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থল বা অন্য কোন যথাযথ স্থানে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করিবেন এবং উক্তরূপে গৃহীত জবানবন্দি তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত সামিল করিয়া ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবার নিমিত্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার বা ব্যক্তির নিকট সরাসরি প্রেরণ করিবেন।
(৩) যদি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বিচার কোন ট্রাইব্যুনালে শুরু হয় এবং দেখা যায় যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন জবানবন্দি প্রদানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না, তাহা হইলেট্রাইব্যুনাল উক্ত জবানবন্দি মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে:
তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না।
রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, ইত্যাদির সাক্ষ্যঃ
২৩। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন চিকিৎসক, রাসায়নিক পরীক্ষক, সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ, আংগুলাংক বিশারদ অথবা আগ্নেয়াস্ত্র বিশারদকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে

কোন বিষয়ে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিবেদন প্রদান করিবার পর বিচারকালে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয় বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না তাহা হইলে তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট এই আইনের অধীন বিচারকালে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ঃ

২৬। (১) এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলা সদরে একটি করিয়া ট্রাইব্যুনালে থাকিবে এবং প্রয়োজনে সরকার উক্ত জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনালেও গঠন করিতে পারিবে; এইরূপ ট্রাইব্যুনালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে নামে অভিহিত হইবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনালে গঠিত হইবে এবং সরকার জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্য হইতে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনবোধে, কোন জেলা ও দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারায় জেলা জজ ও দায়রা জজ বলিতে যথাক্রমে অতিরিক্ত জেলা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজও অন্তর্ভুক্ত।

অপরাধে প্ররোচনা বা সহায়তার শাস্তি ঃ

৩০। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা যোগান এবং সেই প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টা করা হয় বা কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে ঐ অপরাধ সংঘটনের জন্য বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টার জন্য নির্ধারিত দন্ডে প্ররোচনাকারী বা সহায়তাকারী ব্যক্তি দন্ডনীয় হইবেন।

<u>সহায়কের জন্য নোট</u>

অধিবেশন ০৫- শিরোনাম ঃ বিশেষ ভাবে সক্ষম ও হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যতা

আলোচ্য বিষয়:

- বিশেষভাবে সক্ষম ও হিজড়া বলতে আমরা কাদের বুঝি
- বিশেষভাবে সক্ষম ও হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক বৈষম্যতা দূরীকরণে করনীয়

উদ্দেশ্য:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

ক. বিশেষভাবে সক্ষম ও হিজড়া বলতে আমরা কাদের বুঝি এ সম্পর্কে জানতে পারবেন
খ. বিশেষভাবে সক্ষম ও হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক বৈষম্যতা দূরীকরণে করনীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন

পদ্ধতিঃ আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর

উপকরণ: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টি মিডিয়া এবং প্রজেক্টর

সময়: ৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া:

- সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা শুরু করুন
- বিশেষভাবে সক্ষম ও হিজড়া বলতে আমরা কাদের বুঝি এ সম্পর্কে কি বুঝি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- বিশেষভাবে সক্ষম ও হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক বৈষম্যতা দূরীকরণে করনীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন
- সবাইকে মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন

অধিবেশন ০৫ ঃ বিশেষ ভাবে সক্ষম ও হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যতা

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১

(২০০১ সনের ১২ নং আইন)

যেহেতু প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে তাহাদের অংশগ্রহণ ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞাঃ

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “জেলা কমিটি” অর্থ ধারা-১২ এর অধীন গঠিত জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটি;

(খ) “তফসিল” অর্থ এই আইনের তফসিল;

(গ) “নির্বাহী কমিটি” অর্থ ধারা-৮ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী কল্যাণ নির্বাহী কমিটি;

(ঘ) “প্রতিবন্ধী” অর্থ ধারা-৩ এ বর্ণিত কোন ব্যক্তি;

(ঙ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) “সমন্বয় কমিটি” অর্থ ধারা-৪ এর অধীন গঠিত জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমন্বয় কমিটি।

প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা ও প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণঃ

৩। (১) “প্রতিবন্ধী” অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি-

(ক) জন্মগতভাবে, বা রোগাক্রান্ত হইয়া, বা দুর্ঘটনায় আহত হইয়া, বা অপচিকিৎসায়, বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানষিকভাবে ভারসাম্যহীন; এবং

(খ) উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে-

(অ) স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন; এবং

(আ) স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সংজ্ঞার আওতায় নিম্নবর্ণিত যে কোন প্রতিবন্ধী ও অন্তর্ভুক্ত-

(ক) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার-

(অ) এক চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই; বা

(আ) উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই; বা

(ই) ভিজুয়েল এ্যকুইটি, যথাযথ লেন্স ব্যবহার করা সত্ত্বেও, ৬/৬০ অথবা ২০/২০০ (লেন্সের পদ্ধতি) অতিক্রম করে না; বা

(ঈ) দৃষ্টি সীমা (field of vision) ২০ ডিগ্রী কোণের বিপ্রতীপ কোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে;

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার-

(অ) একটি বা উভয় হাত নাই; বা
(আ) কোন হাত পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপ-ধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা
(ই) একটি বা উভয় পা নাই; বা
(ঈ) কোন পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপ-ধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা
(উ) শারীরিক গঠন বিকৃত বা অস্বাভাবিক; বা
(ঊ) স্নায়ুবিক বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য নাই;
(গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার অপেক্ষাকৃত সুস্থ কানের শ্রবণ ক্ষমতা, সাধারণ কথোপকথন শ্রবণের ক্ষেত্রে, ৪০ ডেসিবল (ধ্বনির একক) বা ততধিক মাত্রায় নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্থ বা অকার্যকর;
(ঘ) বাক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার স্বাভাবিক অর্থবোধক ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট বা অকার্যকর;

(ঙ) মানসিক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার-
(অ) বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বুদ্ধির পূর্ণতা ঘটে নাই বা যাহার বুদ্ধাংক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম; বা
(আ) মানসিক ভারসাম্য নাই বা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হইয়াছে;
(চ) বহু মাত্রিক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার উপরি-উল্লেখিত একাধিক প্রতিবন্ধিতা রহিয়াছে;
(ছ) সমন্বয় কমিটি কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন প্রতিবন্ধী।
জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন ও পদত্যাগঃ
৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমন্বয় কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হইল, যথা:-
(ক) সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, পদাধিকারবলে, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;
(খ) সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে, যিনি উক্ত কমিটির সহ-সভাপতিও হইবেন;
(গ) স্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে;
(ঘ) স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে;
(ঙ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে কর্মরত অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন চিকিৎসক, যিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত হইবেন;
(চ) পঙ্গু হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, পদাধিকারবলে;
(ছ) বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি, পদাধিকারবলে;
(জ) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার পাঁচজন প্রতিনিধি, যাহারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন;
(ঝ) বাংলাদেশ মানসিক প্রতিবন্ধী হাসপাতালের পরিচালক, পদাধিকারবলে;
(ঞ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে;
(ট) নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ, পদাধিকারবলে;
(ঠ) পরিচালক, জাতীয় চক্ষু ইনষ্টিটিউট, পদাধিকারবলে;
(ড) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বা সরকার কর্তৃক মনোনীত, যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্ন এমন একজন কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সচিবও হইবেন।
(২) উপ-ধারা (১) (জ) তে উল্লেখিত-
(ক) যে কোন সদস্যের মনোনয়ন বাতিলক্রমে সরকার তাহার সদস্যপদের অবসান ঘটাইতে পারিবে;
(খ) যে কোন সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।
(৩) সরকার প্রয়োজনে অন্য কোন ব্যক্তিকে সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করিতে পারিবে।
সদস্য পদের অযোগ্যতাঃ
৫। ধারা ৪(১)(জ) এর অধীনে মনোনীত কোন ব্যক্তি সদস্য হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি-
(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন বা উহা পরিত্যাগ করেন বা হারান; বা
(খ) তাহাকে কোন উপযুক্ত আদালত অপ্রকৃতস্থ বলিয়া ঘোষণা করে; বা
(গ) তিনি আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং তাহার দেউলিয়াত্বের অবসান না হয়; বা

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হইয়া থাকেন; বা

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন।

জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

৬। (১) সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যোগ্যতা অনুসারে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং তাহাদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণকল্পে সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা এবং বিরাজমান বাস্তবতার নিরীখে উহা সংশোধনের সুপারিশ বা প্রয়োজনে নূতন নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করা;

(খ) প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্প গ্রহণে সরকারকে পরামর্শ দান;

(গ) এই আইন ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের আলোকে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কর্মরত নির্বাহী কমিটি ও জেলা কমিটিসহ সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার কার্যাবলীর সমন্বয়, পর্যালোচনা ও এতদ্‌বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং অন্যান্য সংস্থাকে উদ্বুদ্ধ করা;

(ঙ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(চ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় তথ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা;

(ছ) আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতিবন্ধীদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির সহিত জাতীয় নীতিমালা ও প্রযোজ্য আইন কানুনের সঙ্গতি রক্ষা এবং উহাদের বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(জ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক আইন কানুন সময় সময় পর্যালোচনা ও সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ঝ) প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;

(ঞ) এই উপ-ধারায় বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতার আওতায় তফসিলে উল্লেখিত কার্যক্রমগুলি সমন্বয় কমিটির কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উক্ত কমিটি সরকারের যে কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বেসরকারী সংস্থাকে অনুরোধ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দেশনা বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

<u>সহায়কের জন্য নোট</u>

অধিবেশন ০৬- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এ ডি আর)

আলোচ্য বিষয়ঃ

- এডিআর বলতে কি বুঝি?
- এডিআর করার নিয়ম নীতিসমূহ
- যে সকল বিষয়ে এডিআর করা যাবে
- যে সকল বিষয়ে এডিআর করা যাবে না

উদ্দেশ্যঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

ক. এডিআর বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বলতে কি বুঝি এ সম্পর্কে জানতে পারবেন
খ.এডিআর বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করার নিয়ম নীতিসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন
গ.যে সকল বিষয়ে এডিআর করা যাবে এ সম্পর্কে জানতে পারবেন
ঘ.যে সকল বিষয়ে এডিআর করা যাবে না এ সম্পর্কে জানতে পারবেন

পদ্ধতিঃ দলগত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর ও দলীয় কাজ

উপকরণ:পোস্টার, মার্কার, ভিপ কার্ড, ব্রাউন পেপার ইত্যাদি

সময়ঃ ৩০ মিনিট

প্রক্রিয়াঃ

- সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা শুরু করুন
- অংশগ্রহণকারীদের এডিআর বা বিকল্প বিরোধ নিষপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাদের ধারনা যাচাই করুন অত:পর এডিআর বা বিকল্প বিরোধ নিষপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের এডিআর বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করার নিয়ম নীতিসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাদের ধারনা যাচাই করুন এবং অত:পর এডিআর বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির নিয়ম নীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- যে সকল বিষয়ে এডিআর করা যাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- যে সকল বিষয়ে এডিআর করা যাবে না এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- সবাইকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন

পদক্ষেপ ০৬ ঃ বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (এ ডি আর)

বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি

বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি বা ADR একটি তুলনামূলক নতুন ধারণা। এটি Litigation বা মামলা শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথাগতভাবে এটি বিদ্যমান আদালত এর বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কোন সমস্যা সমাধান করে না। ADR বলতে ওই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে মামলায় যেতে অনিচ্ছুক পক্ষসমূহ প্রচলিত আদালতের বিচার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অন্য কোন মধ্যস্থতায় তাদের পারস্পারিক বিদ্যমান বিরোধ নিস্পত্তি করে থাকে। এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে মামলার বিভিন্ন জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা। এডিআর এর বিভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে। মূলত: তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি করা হয়ে থাকে যেগুলো নিম্নরূপ-

১। মধ্যস্থতা (Mediation)
২। সালিশী (Arbitration)
৩। আপোষ আলোচনা (Negotiation)

এডিআরের প্রয়োজনীয়তা

- এডিআর কার্যক্রমটি উন্মুক্ত নয় বরং শুধুমাত্র পক্ষদ্বয়ের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ বিরোধের মীমাংসা এবং এর ফলাফল উন্মুক্তভাবে প্রকাশিত হয় না তাই এটি সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের ব্যাক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করে
- প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় চেয়ে এটি কম আনুষ্ঠানিক বিধায় খুব বেশি লিখিত কাগজাদি ব্যবহৃত হয়না।
- উভয়পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা হয়
- স্বল্প সময় ও কম খরচে বিরোধ মীমাংসা হয়
- বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির মাধ্যমে বিরোধীয় বিষয়ে সমাধান হলে ভবিষ্যতে পক্ষগণের মধ্যে বৈরিতা হ্রাস পায়।

এডিআরের সঙ্গে গ্রাম আদালতের সম্পর্ক

বিধি-৩১

গ্রাম আদালত আইন. ২০০৬ বিরোধীয় পক্ষদ্বয়কে চেয়ারম্যানের সন্মুখে আলোচনার সুযোগ করে দেয়। আলোচনা পরবর্তী পক্ষদ্বয় যদি একই রকম সিদ্ধান্তে উপণিত হন এবং প্রতিবাদী আবেদনকারীর চাহিদা মোতাবেক তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে সম্মত হলে বিরোধটি অতি দ্রুত বিধি -৩১ এর মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়। চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে দুই পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে বিরোধটি লাঘব হয়।

প্রাক-বিচার

গ্রাম আদালত গঠন পরবর্তী প্রাক বিচারে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিরোধটি মীমাংসার জন্য একজন চেয়ারম্যানের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬ (খ) অনুযায়ী প্রথম শুনানীঅন্তে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান বিরোধটি মীমাংসার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করবেন।

এডিআরের ধরণ ঃ

মধ্যস্থতা কি?

মধ্যস্থতা বা Mediation হলো বিরোধ নিস্পত্তির একটি উপায়। এর মাধ্যমে মূলত: আপোষ মীমাংসাকে বুঝানো হয়। এ ব্যবস্থায় একটি তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি প্রয়োজন। তৃতীয় পক্ষ বিরোধীয় পক্ষগণের মধ্যে মধ্যস্থতা করে আপোষ মীমাংসার উপণীত হতে সহায়তা করে। মধ্যস্থতা একটি স্বেচ্ছাপ্রনোদিত প্রক্রিয়া যেখানে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে একজন নিরপেক্ষ ব্যাক্তি একটি সমাধানের পথ খোঁজে নিতে পক্ষগণকে সর্বোত্তভাবে সহায়তা করে। এটি একটি আনুষ্ঠানিক ও অপ্রতিদ্বন্ধিতামূলক পদ্ধতি যেখানে পক্ষগণ নিজেরাই যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও আনিসুজ্জামান সম্পাদিত আইন শব্দ কোষে মধ্যস্থতা সম্পর্কে বলা হয়েছে "এটি হলো বিকল্প বিবাদ-নিস্পত্তির রূপবিশেষ, যাহাতে একটি স্বাধীন তৃতীয়পক্ষ বাদী ও বিবাদীর নিকট পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য নিস্পত্তির জন্য বিবাদে লিপ্ত পক্ষগুলিকে আলোচনায় সহায়তা করে। মধ্যস্থ একজন আইনজীবি কিংবা আইনজীবি না হইয়া বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে পারেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো ক্ষমতা নাই, পক্ষগুলিকে কোনো মীমাংসা মানিয়া নিতে তিনি বাধ্যও করিতে পারেন না।"

International Finance Corporation কর্তৃক তৈরিকৃত IFC Mediation Handbook এ বলা হয়েছে " মধ্যস্থতা ব্যবস্থা হচ্ছে কলহ বিবাদ নিরসনের একটি সহজ ও সামাজিক পদ্ধতি, যেখানে একজন নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যাক্তি বা একদল নিরপেক্ষ ব্যাক্তি বিবাদমান দুটি পক্ষকে দ্বন্দ্ব নিরসনে পারস্পরিক সমঝোতায় পৌঁছাতে সাহায্য করেন।

মধ্যস্থতাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন: আদালত কেন্দ্রিক মধ্যস্থতা, আদালত বহির্ভূত মধ্যস্থতা। বিচারক নিজেই যখন মধ্যস্থতা কার্যক্রম পরিচালনা করে তখন একে বিচারিক বা আদালত কেন্দ্রিক মধ্যস্থতা বলা হয়। অন্যদিকে আদালত বহির্ভূত অনান্য পন্থায় অর্থাৎ আইনজীবি বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কোনো মধ্যস্থতা কার্যক্রম হলে এটাকে আদালত বহির্ভূত মধ্যস্থতা বলা হয়।

সালিশ

দেওয়ানি বা ফৌজদারি উভয় ধরণের ছোট-খাটো বিবাদ-বিরোধ বিচারের অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা হলো সালিশ। কার্যত বহু অপরাধেরই উদ্ভব ঘটে জমিজমা নিয়ে বিরোধ ও পারিবারিক বিরোধ থেকে, যেগুলো পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সহজ হয়। যদিও ছোটখাটো ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিহিংসামূলক মনোভাব পরিহার করে বিরোধ নিস্পত্তি করা শ্রেয়, তথাপি মামলা আদালতে গেলে তা যত ছোটই হোক, সহজে নিস্পত্তির চেয়ে তা লড়ার প্রবণতাই প্রবল থাকে। তাই বিরোধের নিস্পত্তি হয় না, বরং বিরোধে জড়িত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে এবং সাধারণভাবে গোটা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও শত্রুতা আরও বৃদ্ধি পায়।

আলোচনা

কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই কোনও ব্যবস্থা যখন দুইপক্ষকে সরাসরি আলোচনা করতে সহায়তা এবং উৎসাহিত করে তাই হলো আলোচনা। আলোচনার মাধ্যমে পক্ষদ্বয় বিরোধীয় বিষয় নিজেদের মধ্যে নিস্পত্তি করেন।

মূল্যায়ন ঃ প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়:

- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষনে শিক্ষনীয় বিষয়ের উপর জ্ঞান যাচাই
- প্রত্যাশা যাচাই করা
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য যাচাই করা

উদ্দেশ্য:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

ক) অংশগ্রহনকারীরা তাদের প্রশিক্ষণে কতটুকু প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে সে বিষয়ে যাচাই করতে পারবেন
খ) প্রশিক্ষন পরবর্তী মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন
গ) প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন

পদ্ধতি: বক্তৃতা এবং আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র
সময়: ২০ মিনিট

উপকরণ: প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র, ফেষ্টুন, ব্যানার, লিফলেট, সিজার, এন্টি কাটার, টিস্যু, পোষ্টার পেপার, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টি মিডিয়া এবং প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম, ডিজিটাল ব্যানার, প্রশ্ন পত্র, ফোল্ডার, নোট বুক, নোট প্যাড, ব্রাউন পেপার, কলম, পেনসিল, কালার পেপার, আইকা গাম, কষ্টেপ, বোর্ড পিন, ফিতা।

প্রক্রিয়াঃ

- সহায়ক সকলকে একটি করে ভিপ কার্ড দিয়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে এই প্রশিক্ষণে তাদের প্রত্যাশা মোতাবেক কি কি বিষয় শিখতে পেরেছে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ৫ টি করে লিখতে বলবেন । লেখা শুরুর আগে অংশগ্রহণকারীদের সকলকে ভিপ কার্ড লেখার নিয়ম বলে দিতে হবে।
- লেখা হয়ে গেলে কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন এবং জোরে পড়ে ভিপ বোর্ডে সহ-সহায়কের সহোযোগিতা নিয়ে শিখনীয় বিষয়সমূহ ডিসপ্লে করুন। ডিসপ্লে করার সময়ে শিখনীয় বিষয়সমূহ ভাগ প্রকার ভাগ করে নিন।
- এপর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের হাতে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র সরবরাহ করুন। এবং এই প্রশ্নপত্রের ফাকা জায়গায় উত্তর লিখতে বলুন। উত্তর লিখার জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্ধ করুন ।বরাদ্দকৃত সময় শেষে উত্তরপত্র সংগ্রহ করুন।
- অংশগ্রহণকারীদেরকে বলুন যথাসময়ে আপনাদের ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হবে।
- এই অধিবেশনে সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

সমাপনী অধিবেশন ঃ সমাপনী

আলোচ্য বিষয়:

- প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমাপনী ঘোষণা

পদ্ধতি: বক্তৃতা এবং আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর
সময়: ১০ মিনিট

উপকরণ: পোষ্টার পেপার, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টি মিডিয়া এবং প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম, ডিজিটাল ব্যানার,

প্রক্রিয়াঃ

- সহায়ক সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে মধ্য হতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে দুই/তিনজন অংশগ্রহণ মতামত তুলে ধরতে বলবেন। এই প্রশিক্ষণে তাদের কেমন লেগেছে, তাদের দৈনন্দিন জীবনে কতটুকু কাজে লাগবে ইত্যাদি।

- এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ সমাপনী সেশনের অতিথীদের সাথে পরিচিতি তুলে ধরবেন।
- এরপর অতিথীদের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমাপনী ঘোষণা করা হবে।